ঘুরে বেড়াত। কী বলেন?

আমি তাঁর কথায় সায় দিয়ে কিছু একটা বললাম, কিন্তু আমার মাথায় সফদর আলীর এই আশ্চর্য আচরণের কথা ঘুরতে থাকে। এর ব্যাখ্যা পাই কোথায়? অন্যমনস্ক হওয়ার ভান করে থাকলে তিনি শেষ পর্যন্ত কী করেন দেখার জন্যে আমি একটু অপেক্ষা করি। যখন দেখলাম রাস্তায় আশেপাশে কেউ নেই, তখন আবার আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাবার ভান করলাম। খানিকক্ষণের মধ্যেই সফদর আলী আশ্চর্য শব্দ করা শুরু করলেন। প্রথমে বললেন, গুলু গুলু গুলু গুলু। তাতে কাজ না হওয়ায় বললেন, মুচি মুচি মুচি মুচি, খানিকক্ষণ পর ছোট ছোট লাফ দিতে শুরু করলেন। সাথে হাততালি। আমি তবুও জোর করে অন্যমনস্ক হয়ে থাকার ভান করতে থাকি। তখন হঠাৎ তিনি যেটা করলেন, আমি সেটার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। রাস্তায় হাঁটু গেড়ে বসে খানিক দূর হামাগুড়ি দিয়ে গেলেন, তারপর উঠে মুখে থাবা দিয়ে বললেন, লাবা লাবা লাবা লাবা।

আমি বিস্ফোরিত চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম, তিনি স্বাভাবিক স্বরে বললেন, কী হল আপনার?

কেন?

এরকম হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন?

আমি উত্তরে আর কী বলব? ঠিক করলাম, ব্যাপারটা আজকে তাঁর কাছে চেপে যাব। একটু ভেবে দেখতে হবে রহস্যটা কি। সফদর আলীকে একটা দায়সারা উত্তর দিয়ে তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে বাসায় রওনা দিলাম। ফিরে আসার সময় রিকশায় বসে ব্যাপারটা ভেবে দেখার চেষ্টা করি। সফদর আলীর এই অদ্ভুত ব্যবহারের সাথে নিশ্চয়ই বানরটার কোনো সম্পর্ক আছে। বানরটাকে কাজকর্ম শেখানো শুরু করার পর থেকেই এটা শুরু হয়েছে। অন্যমনস্ক হলেই মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে তিনি এটা করেন, প্রথম প্রথম বানরটিও নাকি অন্যমনস্ক থাকত। দুটির মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক আছে? নাকি বানরের সাথে থাকতে থাকতে তাঁর স্বভাবও বানরের মতো হয়ে যাচ্ছে? আর অন্য সব ব্যাপারে তিনি আগের মতোই আছেন। কাজেই বেশি পরিশ্রমে পাগলামি দেখা দিচ্ছে, সেটাও তো হতে পারে না। আমি কিছুই ভেবে পেলাম না। আগে নাকি কাপালিকরা বানরকে দিয়ে কী একধরনের সাধনা করত। কে জানে এটি সেরকম কোনো বানর কি না। এর মাঝে জাদুটোনার ব্যাপার আছে কি না কে বলবে। ভেবে-ভেবে আমি কোনো কূল-কিনারা পেলাম না। ভাবনা-চিন্তা করে আমার অভ্যাস নেই, খানিকক্ষণের মধ্যেই তাই মাথা ধরে গেল, বাসায় এসে দুটো অ্যাসপিরিন খেয়ে তবে রক্ষা।

পরদিন অফিস থেকে বাসায় এসে দেখি আবার টেলিগ্রাম, না-খুলেই বুঝতে পারি এটা সফদর আলীর। সত্যি তাই, ভেতরে লেখা :

মহা আশ্চর্য ব্যাপার। আপনি ঠিক। আমি বলি, গুলু গুলু গুলু গুলু এবং মুচি মুচি মুচি মুচি। কাওরান বাজার। সন্ধ্যা ছয়টা।

তবু ভালো শেষ পর্যন্ত সফদর আলী নিজেই ধরতে পেরেছেন যে, তিনি আশ্চর্য–আশ্চর্য সব শব্দ করছেন। এক জন মানুষ যখন না জেনে কিছু করে, তার জন্যে তাকে দায়ী করা খুব মুশকিল। কে জানে তিনি বুঝতে পেরেছেন কি না, কেন এরকম করছেন, আমার কৌতূহল আর বাঁধ মানছিল না।

ঠিক পাঁচটার সময় আমার ছোট ভাইঝি টেবিল থেকে উল্টে পড়ে মাথা ফাটিয়ে ফেলল। এটি নতুন কোনো ব্যাপার নয়। প্রতি সপ্তাহে না হলেও মাসে অন্তত এক বার করে তার এধরনের কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটে। তাকে নিয়ে দৌড়ালাম ডাক্তারের কাছে, ডাক্তার তার মাথাটা খানিকটা কামিয়ে সেখানে ব্যান্ডেজ করে দিলেন। তাকে নিয়ে ফিরে আসার আগে জিজ্ঞেস করলাম, তার কেমন লাগছে। সে বলল, তার বেশি ভালো লাগছে না, তবে যদি খানিকটা আইসক্রিম খায় তবে মনে হয় ভালো লাগতে পারে। এরকম একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দেবার পর তাকে আইসক্রিম না খাইয়ে বাসায় আনি কেমন করে? আইসক্রিমের দোকান খুঁজে আইসক্রিম কিনে দিয়ে যখন বাসায় ফিরে এলাম, তখন ছয়টা বেজে গেছে। কাওরান বাজারে যেতে যেতে সন্ধ্যা সাতটা বেজে যাবে। সফদর আলীর সময় নিয়ে বাড়াবাড়ি করার অভ্যাস, কাজেই আজ যে তাঁর সাথে দেখা হবে না তা বলাই বাহুল্য। আমি তবু তাড়াহুড়ো করে বের হলাম। চায়ের দোকানে গিয়ে সত্যিই তাঁকে পেলাম না। দোকানি বলল, খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে তিনি নাকি বেরিয়ে গেছেন। তাঁর বাসায় গিয়ে এখন আর লাভ নেই। এরকম সময়ে তিনি কখনো বাসায় থাকেন না। আমি এককাপ চা অর্ডার দিয়ে পুরো ব্যাপারটা ভাবতে বসি। কী হতে পারে ব্যাপারটা? কেন সফদর আলী হঠাৎ করে নিজের অজান্তে এরকম আশ্চর্য শব্দ করা শুরু করেছেন? নিশ্চয়ই বানরটার সাথে একটা সম্পর্ক আছে। হয়তো ব্যাপারটা বুঝতে হলে আগে বানরের ইতিহাসটা জানতে হবে। আমার তখন শান্তিনগরের সেই ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ল, যাঁর কাছ থেকে বানরটা এনেছিলাম, তিনি হয়তো কোনো একটা সমাধান দিতে পারেন। আমি তাড়াতাড়ি করে চা শেষ করে তাঁর বাসায় রওনা দিলাম, কপাল ভালো থাকলে আজকেই তাঁকে পেয়ে যেতে পারি।

বাসাটা আবার খুঁজে বের করতে একটু সময় লাগল, এসব ব্যাপারে আমার স্মৃতিশক্তি খুব দুর্বল। দরজার কড়া নাড়তেই ভদ্রলোক এসে দরজা খুলে দিলেন। আমাকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, আরে আসেন, আসেন। কী খবর আপনার? কয়দিন থেকেই ভাবছি জংবাহাদুরের খোঁজ নিই, ভালোই হল আপনি এসে গেলেন। তারপর চিৎকার করে ভেতরে বললেন, এই, চা দিয়ে যা বাইরে।

আমি ঘরে গিয়ে বসি। ভদ্রতার কথাবার্তা বলতে বলতে বানরের ইতিহাসটা জিজ্ঞেস করার জন্যে সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকি। সফদর আলীর অবস্থাটা এখন তাঁর কাছে গোপন রাখব বলে ঠিক করলাম, শুনে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ঘাবড়ে যাবেন। ভদ্রলোক বেশ কথা বলেন, জংবাহাদুরের খোঁজখবর নিয়ে আবার তাঁর প্রিয় বিষয়বস্তু, মানুষের নামের সাথে চেহারার সামঞ্জস্য নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিলেন। ভেতর থেকে একসময় সর–ভাসা চা এবং সিঙাড়া এল। আমি সিঙাড়ায় কামড় দিয়ে চা

তুলে এক চুমুক খেয়েছি, হঠাৎ ভদ্রলোকের ঘরের ভেতর থেকে শব্দ ভেসে এল, গুলু গুলু গুলু গুলু।

চমকে উঠে বিষম খেলাম আমি, গরম চা দিয়ে তালু পুড়ে গেল। কিন্তু আমার সেটা নিয়ে ব্যস্ত হবার মতো অবস্থা নেই। কান খাড়া করে রাখি আমি, আর তখন সত্যি আবার শুনলাম, গুলু গুলু গুলু গুলু।

আমি চোখ বড় বড় করে ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই শুনলাম, মুচি মুচি মুচি মুচি। তারপর হঠাৎ পর্দা ঠেলে বছরখানেকের একটা ফুটফুটে বাচ্চা থপ থপ করতে করতে ঘরে এসে হাজির হল। আমাকে অপরিচিত দেখে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ায়। তারপর আবার মুখ হাসি হাসি করে আধো আধো গলায় বলল, গুলু গুলু গুলু গুলু।

পুত্রস্নেহে বাবার চোখ কোমল হয়ে ওঠে, তিনি হাত নেড়ে ডাকতেই খুশিতে ছোট ছোট লাফ দিয়ে হাততালি দিতে থাকে, ঠিক সফদর আলী যেভাবে লাফিয়েছিলেন। বাচ্চাটি এখনো ভালো করে হাঁটতে শেখে নি, তাই টাল সামলাতে না পেরে হঠাৎ পড়ে গেল, পড়ে গিয়েও তার খুশি, কে, সেভাবেই হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল তার বাবার দিকে, ঠিক সফদর আলীর মতো।

আমি রহস্য ভেদ করতে গিয়ে আরো বড় রহস্যে পড়ে গেলাম। সফদর আলী যেসব অদ্ভুত শব্দ করছেন সেগুলো এই বাচ্চাটির আধো আধো বুলি, যেসব লাফ–ঝাঁপ বা হামাগুড়ি দিচ্ছেন সেগুলো এই বাচ্চাটির নিখুঁত অনুকরণ। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, তিনি এই বাচ্চাটির অস্তিত্বের কথা পর্যন্ত জানেন না! কেমন করে এটা সম্ভব?

ভদ্রলোকের বাসায় আরো কিছুক্ষণ থাকলাম, কিন্তু আলাপ আর জমল না। কেমন করে জমবে, আমার মাথায় তখন সফদর আলীর কথা ঘুরছে। বাসায় ফিরে আসার সময় রিকশায় বসে আমি পুরো ব্যাপারটি ভাবতে থাকি, ভাবতে ভাবতে মনে হল পুরো মাথাটা ফেটে যাবে, কিন্তু কোনো কূল–কিনারা পেলাম না। বেশি ভাবনা–চিন্তা করে আমার অভ্যাস নেই, চেষ্টা করলে সহজেই মাথা ধরে যায়। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে আমি হাল ছেড়ে দিয়ে যেই রিকশাওয়ালার সাথে গল্প শুরু করলাম, ঠিক তক্ষুনি হঠাৎ করে সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল—একেবারে পানির মতো।

সফদর আলীকে দরকার, তাঁকে পাওয়া মুশকিল বলে আমিও তাঁর কায়দায় তাঁকে একটা টেলিগ্রাম পাঠালাম, তাতে লেখা,
রহস্য উদ্‌ঘাটন। গুলু গুলু গুলু গুলু কেন? সহজ সমাধান। কাওরান বাজার। সন্ধ্যা ছয়টা।

পরদিন সন্ধ্যা ছয়টার সময় কাওরান বাজারে সেই রেস্তরাঁয় গিয়ে দেখি সফদর আলী পাংশু মুখে বসে আছেন, আমাকে দেখে প্রায় ছুটে এলেন, গলা নামিয়ে বললেন, একটা ব্যাপার হয়েছে।

কি ব্যাপার?

আমার গবেষণা নিশ্চয়ই জানাজানি হয়ে গেছে, আমার পিছনে দেশী–বিদেশী

banglabook.com

এজেন্ট লেগে গেছে।

কী ভাবে জানলেন?

আমি যে আশ্চর্য-আশ্চর্য শব্দ করি সেটা পর্যন্ত জেনে গেছে। আজ একটা টেলিগ্রাম পেলাম, কে পাঠিয়েছে জানি না, লিখেছে রহস্য উদ্‌ঘাটন।

আমি অবাক হয়ে বললাম, আপনি বুঝতে পারেন নি, এটা আমি পাঠিয়েছি।

আপনি! সফদর আলী মনে হল আকাশ থেকে পড়লেন, আপনি রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন?

হ্যাঁ।

তাঁকে দেখেই বুঝতে পারলাম তিনি আমাকে বিশ্বাস করছেন না। কিন্তু সেটা প্রকাশ করলেন না, একটু রেগে বললেন, টেলিগ্রাম করেছেন তো নাম লেখেন নি কেন?

আপনিও তো আপনার টেলিগ্রামে নাম লেখেন না।

আমি যদি নাম না লিখি সেটা আমার ভুল। আমি একটা ভুল করি বলে আপনিও একটা ভুল করবেন?

এর উত্তরে আমি আর কী বলব?

সফদর আলী খানিকক্ষণ পর একটু শান্ত হয়ে বললেন, রহস্যটা বলেন, তাহলে শুনি।

আমি হাসি চেপে বললাম, বানরটাকে আপনি কেমন করে শেখান মনে আছে? পুরস্কার পদ্ধতি। যখনই বানর একটা ঠিক জিনিস করে আপনি তাকে একটা পুরস্কার দেন, একটা কলা বা কোনো একটা খাবার।

হ্যাঁ।

আসলে একই সময়ে বানরটাও আপনার উপরে পুরস্কার পদ্ধতি খাটিয়ে যাচ্ছে। আপনি যখন ঠিক জিনিসটা করেন বানরও তখন আপনাকে একটা পুরস্কার দেয়। সেটা হচ্ছে তার মনোযোগ। বানরের কাছে কলাটা যত মূল্যবান আপনার কাছে বানরের মনোযোগ ঠিক ততটুকু মূল্যবান। আপনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন বানরের মনোযোগের জন্যে, অনেক কিছু করতে করতে যখন হঠাৎ করে ঠিক জিনিসটা করে ফেলেন, বানর তখন পুরস্কার হিসেবে আপনাকে তার মনোযোগ দেয়।

সফদর আলী অবাক হয়ে বললেন, ঠিক জিনিসটা কি?

সে যেটা শুনতে চায়।

কী শুনতে চায় সে?

বানরটা যে বাসা থেকে এনেছি, সে বাসায় একটা ছোট বছরখানেকের বাচ্চা আছে, বানরটার সাথে তার খুব বন্ধুত্ব ছিল। বানরটার বাচ্চাটার জন্যে খুব মায়া জন্মেছিল, আপনার বাসায় আসার পর থেকে সে তাকে আর দেখে না। বানরটা নিশ্চয়ই বাচ্চাটাকে খুব দেখতে চাইছিল, তার গলার স্বর শুনতে চাইছিল। কাজেই আপনি যখনি সেই ছোট বাচ্চাটির মতো শব্দ করেন বা তার মতো লাফ দিয়ে হাততালি দেন, হামাগুড়ি দেন—সে খুশি হয়ে আপনাকে তার মনোযোগ দেয়।

সফদর আলী অবিশ্বাসের স্বরে বললেন, আপনি কী ভাবে জানেন?

আমি কাল জংবাহাদুরের মালিকের বাসায় গিয়েছিলাম, বাচ্চাটিকে দেখে এসেছি,

বাচ্চাটি কিছু হলেই বলে, গুলু গুলু গুলু গুলু বা মুচি মুচি মুচি মুচি। জংবাহাদুরের মনোযোগের জন্যে এখন আপনিও নিজের অজান্তেই বলেন, গুলু গুলু গুলু গুলু। মুচি মুচি মুচি মুচি।

সফদর আলী বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে-আস্তে বললেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন, আসলে তা-ই হয়েছে। বানরটাকে মনোযোগ বাড়ানোর ওষুধ খাওয়াতে না পেরে নিজেই একটু চেখে দেখছিলাম, নিজের মনোযোগ তাই বেড়ে গিয়েছিল দশগুণ। তাই থেকে সফদর আলী আপন মনে কী একটা ভাবতে-ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন।

আমি বললাম, এখন যখন কারণটা জেনেছেন, একটু সতর্ক থাকবেন।

সফদর আলী আমার কথা শুনলেন বলে মনে হল না। আমি ডাকলাম একবার, কোনো সাড়া নেই। ঠাট্টা করার জন্যে গলা উঁচিয়ে বললাম, গুলু গুলু গুলু।

সফদর আলী ঠাট্টা-তামাশা বোঝেন কম, আমার কথা শুনে ভীষণ চমকে উঠে চায়ের কাপ উল্টে ফেললেন, আমার দিকে ঘুরে তাকালেন, আস্তে-আস্তে তাঁর চোখ বড়-বড় হয়ে উঠতে থাকে।

আমি একটা নিঃশ্বাস ছাড়ি। ঠাট্টা-তামাশা বাড়ানোর একটা ওষুধ বের করতে পারলে মন্দ হত না, ডাবল ডোজ খাইয়ে দেয়া যেত সফদর আলীকে।

গাছগাড়ি

সফদর আলীর চোখ মুখ খুশিতে ঝলমল করছিল, আমাকে দেখে চোখ নাচিয়ে বললেন, বলেন দেখি আজ কোথায় গিয়েছিলাম?

আমি মাথা চুলকে বললাম, সিনেমা দেখতে?

ধুর! সিনেমা আবার মানুষ দেখে নাকি?

আমি এইমাত্র ম্যাটিনি শো'তে একটা প্রচণ্ড মারামারির সিনেমা দেখে এসেছি, তাই মন্তব্যটা কোনোমতে হজম করে বললাম, তাহলে কি নাটক?

আরে না না, ওসব নাটকফাটক আমি দেখি না!

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, তাহলে কি কোনো কনফারেন্স, যেখানে সব বিজ্ঞানীরা এসে—

সফদর আলী হো-হো করে হেসে উঠলেন, তিনি জোরে হাসেন কম, তাই আমি একটু অবাক হয়ে যাই। হাসি থামিয়ে বললেন, বিজ্ঞানীরা আমাকে তাদের কনফারেন্সে ঢুকতে দেবে কেন? আমি কোথাকার কে?

আমি প্রতিবাদ করার চেষ্টা করছিলাম, সফদর আলী আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, পারলেন না তো বলতে! রমনা পার্কে গিয়েছিলাম।

রমনা পার্ক?

হ্যাঁ, ঐ যে শিশুপার্কের পাশ দিয়ে গিয়ে—

হ্যাঁ, চিনি আমি।

banglabook.com

চেনেন? সফদর আলী খুব অবাক হলেন বলে মনে হল।

চিনব না কেন? রমনা পার্ক না চেনার কী আছে, যখন কলেজে পড়তাম, নতুন সিগারেট খাওয়া শিখে—

আপনি রমনা পার্ক চেনেন অথচ আমাকে একবার বললেন না?

আমি অবাক হয়ে বললাম, কী বললাম না?

রমনা পার্কের কথা।

আমার খানিকক্ষণ সময় লাগে তাঁর কথাটা বুঝতে। অবাক হয়ে বললাম, আপনি এত বছর ধরে ঢাকায় আছেন আর রমনা পার্ক চেনেন না?

সফদর আলী থতমত খেয়ে বললেন, কেমন করে চিনব?

আর সবাই যেভাবে চেনে, আমরা যেভাবে চিনেছি। পয়লা বৈশাখ কত সুন্দর গান হয় সেখানে, বিজ্ঞানী হয়েছেন দেখে এসবের খোঁজখবরও রাখবেন না?

আমার ধমক খেয়ে সফদর আলী একটু নরম হয়ে গেলেন। কেউ যখন আমার উপর কিছু একটা নিয়ে রেগে যায়, আমি তখন উল্টো তার উপর আরো বেশি রেগে যাওয়ার চেষ্টা করি সবসময়, তাহলে তার রাগ কমে আসে। সফদর আলীকে সহজ করানোর জন্যে বললাম, কী দেখলেন পার্কে?

তার মুখ খুশিতে ঝলমল করে ওঠে, একগাল হেসে বললেন, গাছ!

গাছ?

হ্যাঁ, গাছ। সফদর আলীর মুখে হাসি আর ধরে না।

আগে আপনি গাছ দেখেন নি?

দেখব না কেন, গাছ না দেখার কী আছে?

তাহলে?

এবারে অন্যরকমভাবে দেখলাম, কাছে এসে অনেক সময় নিয়ে ধীরে ধীরে, বলতে বলতে সফদর আলীর মুখে কেমন একটা অপার্থিব হাসি ফুটে ওঠে। গাছ নিয়ে তাঁর উচ্ছ্বাসে আমার একটু অবাক লাগে, বাংলাদেশের মানুষ গাছে গাছেই তো বড় হয়, সাহারা মরুভূমি থেকে এলে না হয় একটা কথা ছিল।

আপনি জানেন, সফদর আলী হঠাৎ মুখ গম্ভীর করে বললেন, এক ধরনের গাছ আছে, সেটা লতার মতো। তার কোনো শক্ত কাণ্ড নেই, অন্য গাছ বেয়ে বেয়ে ওঠে—

সফদর আলী ঠাট্টা করছেন কি না বুঝতে পারলাম না, আমি তাঁর দিকে ভালো করে তাকালাম না, ঠাট্টা-তামাশার মানুষ সফদর আলী নন। সত্যিই তিনি লতানো গাছের কথা বলছেন। এমনভাবে বলছেন যেন এই প্রথম বার একটা লতানো গাছ দেখেছেন।

কোনো কোনো লতানো গাছ থেকে আবার শুঁড়ের মতো বের হয়, সেগুলো আবার এটা-সেটা আঁকড়ে ধরে উপরে উঠতে থাকে। মজার ব্যাপার জানেন, সেই শুঁড়গুলো সবসময় একই দিকে পেঁচায়। তার উপর—

সফদর আলী এরপর টানা আধ ঘন্টা উচ্ছ্বাসভরে গাছের কথা বলে গেলেন, আমাকে ধৈর্য ধরে শুনতে হল। গাছের পাতার রং সবুজ। কিন্তু ফুলগুলো সবুজ নয়, সেগুলো রঙিন, ফুল থেকে আবার ফল হয়, এই ধরনের কথাবার্তা। না শুনলেও

আমার যে খুব ক্ষতি হত সেরকম বলব না।

সফদর আলীর সাথে এরপর বেশ অনেকদিন দেখা নেই। মাঝে মাঝে তিনি এরকম ডুব মারেন, আমার নিজেরও কাজকর্ম ছিল, তাই আর খোঁজখবর করি নি। গাছপালা নিয়ে তাঁর উচ্ছ্বাস কমেছে কি না জানার জন্যে কৌতূহল ছিল। বিজ্ঞানী মানুষ, লোহালক্কড় নিয়ে কারবার, গাছপালা নিয়ে বেশিদিন ব্যস্ত থাকতে পারবেন না তাতে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। তাই কাওরান বাজারে চায়ের দোকানে আবার যখন তাঁর সাথে দেখা, আমি একটু অবাক না হয়ে পারলাম না। টেবিলে নানারকম গাছের পাতা বিছানো, হাতে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে গাছের পাতাগুলো লক্ষ করছেন। হাতে একটা নোটবুক, একটু পরে পরে সেখানে তিনি কী যেন টুকে রাখছেন। পাশের চায়ের কাপে চা ঠাণ্ডা হচ্ছে, তাঁর চুমুক দেবার কথা মনে নেই। আমি সামনের চেয়ারে বসলাম, তিনি লক্ষ পর্যন্ত করলেন না। একটু কেশে ডাকলাম, সফদর সাহেব—

তিনি ভীষণ চমকে উঠে গাছের পাতাগুলো তাড়াতাড়ি ঢেকে ফেলতে চেষ্টা করলেন, হাতের ধাক্কায় চায়ের কাপ উল্টে সারা টেবিল চায়ে মাখামাখি হয়ে গেল। আমাকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ও আপনি! আমি ভাবলাম—

কী ভাবলেন?

নাহ্, কিছু না। সফদর আলী তাঁর অভ্যাসমতো প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে সাবধানে টেবিল থেকে গাছের পাতাগুলো তুলে নোটবুকের ভেতর রাখতে রাখতে বললেন, জীবজন্তু থেকে গাছ আরো বেশি কাজের। গাছ নিজের খাবার নিজে তৈরি করতে পারে।

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না সফদর আলী কী বলতে চাইছেন। কল্পনা করার চেষ্টা করলাম, একটা গাছ নিজের খাবার নিজে তৈরি করছে, চুলোয় ভাত চাপিয়ে দিয়ে মাছ কুটতে বসেছে। দৃশ্যটা বেশিক্ষণ ধরে রাখা গেল না। একটু ইতস্তত করে বললাম, গাছ আবার নিজের খাবার নিজে তৈরি করে কী ভাবে? আমি যতদূর জানি মানুষ শুধু নিজের খাবার নিজে তৈরি করতে পারে। সবাই অবশ্যি পারে না, আমি রান্না করলে সেটা—

ধেৎ! আমাকে থামিয়ে দিয়ে সফদর আলী বললেন, আমি কি রান্না করার কথা বলছি? আমি বলছি খাবার তৈরি করা। বুঝতে পারলেন না?

আমি মাথা নাড়লাম, সত্যিই বুঝি নি। সফদর আলী হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, ঠিক আছে, বুঝিয়ে দিচ্ছি। মানুষ কী খায়?

সেটা নির্ভর করে কী রকম মানুষ, তার উপর। যাদের পয়সাকড়ি আছে তারা মাছ, মাংস, দুধ, ফলমূল খায়, যাদের নেই তারা ডাল-ভাত পেলেই খুশি।

ঠিক আছে, ডাল-ভাত দিয়ে শুরু করা যাক, আপনি ডাল-ভাত তৈরি করতে পারবেন?

না।

কিন্তু গাছ পারে, ডাল আর ভাত গাছ থেকেই এসেছে।

আমরা তো মাছও খাই, মাছ তো গাছ থেকে আসে না। দেখেছেন কখনো "মাছ

গাছ"?

কিন্তু মাছ কী খেয়ে বড় হয়?

আমি একটু মাথা চুলকে বললাম, বড় মাছ ছোট মাছদের খায়।

ঠিক আছে, ছোট মাছরা কী খায়? খুঁজে দেখেন সেগুলো শ্যাওলাজাতীয় কোনো এক ধরনের গাছ খেয়ে বড় হচ্ছে। আপনি মাংস খান, মাংস কোথা থেকে এসেছে? গরু থেকে। গরু কী খেয়ে বড় হয়? ঘাস খেয়ে। আপনি যেটাই দেখবেন সেটাই ঘুরেফিরে গাছপালার উপর বেঁচে আছে। কিন্তু গাছপালা? তারা কী খেয়ে বড় হচ্ছে? পানি আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড। সূর্যের আলো ব্যবহার করে পানি আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড দিয়ে তৈরি করে কার্বোহাইড্রেড, সেটা দিয়ে সারা পৃথিবী বেঁচে আছে। পারবেন আপনি কার্বোহাইড্রেড তৈরি করতে?

আমাকে স্বীকার করতেই হল যে পানি আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করে কার্বোহাইড্রেড তৈরি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পানির সাথে চিনি আর লেবুর রস দিয়ে শরবত তৈরি করতে পারি, কিন্তু কার্বোহাইড্রেড? অসম্ভব।

পৃথিবীর কোনো বিজ্ঞানী এখনো পারে নি, সালোকসংশ্লেষণ দিয়ে গাছ শুধু যে কার্বোহাইড্রেড তৈরি করে তাই নয়, গাছ কার্বন-ডাই-অক্সাইড ভেঙে অক্সিজেন তৈরি করে, সেই অক্সিজেন না থাকলে কবে আমি আর আপনি দম বন্ধ হয়ে শেষ হয়ে যেতাম! সালোকসংশ্লেষণ কী ভাবে হয় জানেন?

সফদর আলী এরপর ঝাড়া আধ ঘন্টা লেকচার দিয়ে গেলেন। বিজ্ঞানীদের এই হচ্ছে সমস্যা, নতুন কিছু শিখলে সেটা অন্যদের না শিখিয়ে ছাড়বেন না।

সপ্তাহখানেক পরে হঠাৎ সফদর আলীর একটা টেলিগ্রাম এসে হাজির, টেলিগ্রামে লেখা "মহা আবিষ্কার"। ব্যস, শুধু এই দুটো শব্দ। এর আগেও কিছু নেই, এর পরেও কিছু নেই। সফদর আলীর কাণ্ডকারখানা দেখে আজকাল একটু অভ্যাস হয়ে গেছে। তাই এমন কিছু অবাক হলাম না। মহা আবিষ্কারটা কী হতে পারে ঠিক ধরতে পারছিলাম না। গাছ নিয়ে বাড়াবাড়ি করছেন, তাই সম্ভবত গাছসংক্রান্ত কিছু একটা হবে। কে জানে পানি আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড মিশিয়ে কার্বোহাইড্রেড বানানো শুরু করেছেন কি না। ঠিক করলাম অফিস ফেরত আজ তাঁর বাসা হয়ে আসব। সফদর আলী যদি দাবি করেন মহা আবিষ্কার, আবিষ্কারটা সাঙ্ঘাতিক কিছু না হয়ে যায় না।

বাসা খুঁজে বের করে দরজায় শব্দ করতেই ভেতর থেকে একাধিক কুকুর প্রচণ্ড শব্দ করে ডাকাডাকি শুরু করে দেয়। আমি ভালো করেই জানি বাসায় কোনো কুকুর নেই। বাইরের লোকদের ভয় দেখানোর ব্যবস্থা, তবু ঠিক সাহস হয় না, কুকুরকে আমার ভারি ভয়।

দরজা খুলে গেল। ভাবলাম সফদর আলীর মাথা উঁকি দেবে। কিন্তু উঁকি দিল জংবাহাদুরের মাথা। আমাকে দেখে দরজাটা হাট করে খুলে মুখ খিঁচিয়ে একটা হাসি দেবার ভঙ্গি করল বুড়ো বানরটা। নেহায়েত জংবাহাদুরকে চিনি। এছাড়া মুখ খিঁচিয়ে ওরকম ভঙ্গি করাকে হাসি মনে করার কোনো কারণ নেই। আতিথেয়তায় জংবাহাদুরের তুলনা নেই, আমাকে প্রায় হাত ধরে ভেতরে নিয়ে যায়। ভেতরে আবছা

banglabook.com

অন্ধকার। একটা জানালা খোলা। সেখানে একটা টবে একটা মানি প্লান্ট গাছ নিয়ে সফদর আলী কী একটা করছিলেন, আমাকে দেখে খুব খুশি হয়ে ওঠেন। সফদর আলীকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে। চোখ দুটি মনে হয় জ্বলজ্বল করছে। বললেন, ইকবাল সাহেব, মহা আবিষ্কার করে ফেলেছি!

তাই নাকি? আমি উৎসুকভাবে জিজ্ঞেস করলাম, কী আবিষ্কার?

বলছি, তার আগে চা খাওয়া যাক। সফদর আলী জংবাহাদুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, জংবাহাদুর, চা বানাও।

জংবাহাদুর একটা ইজিচেয়ারে আরাম করে পা দুলিয়ে বসে ছিল। সফদর আলীর কথাটা পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ার ভান করল।

সফদর আলী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বেটা কীরকম পাজি দেখেছেন?

আহা বেচারা! হয়তো কাজকর্ম করে কাহিল হয়ে পড়েছে।

কিসের কাহিল, সবকিছুতে ফাঁকিবাজি। দাঁড়ান, দেখাচ্ছি মজা। সফদর আলী আরো এক পা এগিয়ে গিয়ে বললেন, ঠিক আছে জংবাহাদুর, চা যদি বানাতে না চাও বানিও না, তবে আজ রাতে টেলিভিশন বন্ধ।

বলামাত্র জংবাহাদুরের চোখ খুলে যায়। তড়াক করে লাফ দিয়ে ওঠে, তারপর মুখে কুঁই কুঁই শব্দ করতে করতে দ্রুত ছুটে যায় রান্নাঘরের দিকে।

আমি চোখ গোল-গোল করে তাকিয়ে ছিলাম, অবাক হয়ে বললাম, টেলিভিশন দেখা এত পছন্দ করে?

সবদিন নয়। আজ রাতে বাংলা সিনেমা আছে তো। চলেন, আপনাকে দেখাই আমার আবিষ্কার।

সফদর আলী আমাকে টেনে জানালার কাছে নিয়ে গেলেন। সেখানে টবে সেই মানি প্লান্ট গাছটা। গাছটাকে দেখিয়ে বললেন, এই দেখেন। আমি তাকিয়ে দেখলাম, সাধারণ একটা গাছ। আবিষ্কারটি কী বুঝতে না পেরে বললাম, কী দেখব?

আমার আবিষ্কার।

কোথায়?

দেখছেন না?

আমি আবার তাকিয়ে দেখি, একটা টবে একটা মানি প্লান্ট গাছ, অস্বাভাবিক কিছু নেই। আবিষ্কারটি কী হতে পারে, গাছটার কি চোখ-নাক-মুখ আছে? খুঁজে দেখলাম নেই, তাহলে কি টবটা কোনো রাসায়নিক জিনিস দিয়ে বোঝাই? না, তাও নয়, তাহলে কী হতে পারে? মাথা চুলকে বললাম, না সফদর সাহেব, ধরতে পারছি না।

ধরতে পারছেন না? সফদর আলী একটু অধৈর্য হয়ে বললেন, দেখছেন না মানি-প্লান্টটা কেমন জানালার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে?

তা তো দেখছি, ওদিকে রোদ, ওদিকেই তো যাবে।

সফদর আলীর মাথায় বাজ পড়লেও তিনি এত অবাক হতেন না। চোখ বড় বড় করে বললেন, আপনি জানেন এটা?

না জানার কী আছে। সবাই জানে। ঘরের ভেতরে গাছ থাকলে যেদিকে আলো, গাছ সেদিকে বাড়তে থাকে। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এটাই কী আপনার

banglabook.com

আবিষ্কার?

সফদর আলী দুর্বলভাবে মাথা নাড়লেন, বললেন, হ্যাঁ।

আমার তাঁর জন্যে মায়া হল। বেচারা একা একা থাকে। কোনো কিছু খোঁজখবর রাখেন না। যেটা সবাই জানে সেটা তাঁকে একা একা আবিষ্কার করতে হয়। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম। বাধা দিয়ে বললেন, তাহলে নিশ্চয়ই সেন্সিং ফিডব্যাকও আবিষ্কার হয়ে গেছে। আমি আরো ভাবলাম—

কী বললেন? সেন্সিং কী জিনিস?

সেন্সিং ফিডব্যাক।

সেটা কী জিনিস?

সফদর আলী আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। কোনদিকে আলো আছে গাছ সেটা বুঝতে পারে। শুধু তাই নয়, গাছ সেদিকে যাওয়ারও চেষ্টা করে। কাজেই একটা কিছু ব্যবস্থা করে যদি সেটা বুঝে নেয়া যায় তাহলে গাছকে সেদিকে যেতে সাহায্য করা যায়। গাছের টবটা থাকবে একটা গাড়ির উপর, গাড়ির কন্ট্রোল থাকবে গাছের উপর—

আমি সফদর আলীকে থামিয়ে দিলাম, তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, গাছ গাড়িটাকে চালাবে? অন্ধকারে রেখে দিলে গাছ গাড়িটাকে চালিয়ে রোদে এসে দাঁড়াবে?

হ্যাঁ।

গাছের কি হাত–পা আছে যে গাড়িকে চালাবে?

আমি কি তাই বলেছি? আমি বলেছি ফিডব্যাক। গাছের পাতায়, ডালে ছোট–ছোট "সেন্সিং প্রোব" থাকবে। পাতা যদি ডান দিকে বেঁকে যাওয়ার চেষ্টা করে, "সেন্সিং প্রোব" সেটা অনুভব করে গাড়িটাকে ডান দিকে চালিয়ে নেবে। কন্ট্রোলটা খুব সহজ নয়, অনেকগুলো জটিল সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নতুন একটা মাইক্রোপ্রসেসর বের হয়েছে, সেটা দিয়ে সহজেই কন্ট্রোল করা যাবে। এই দেখেন, আমি ডিজাইনটা করেছি—

সফদর আলী একটা বড় কাগজ টেনে নিলেন, সেখানে হিজিবিজি করে অনেক জটিল নকশা আঁকা, দেখে ভয়ে আমার হাত–পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, এখন এই পুরো জিনিসটা আমাকে বুঝতে হবে? সফদর আলী বোঝাতে শুরু করে হঠাৎ কেমন জানি মিইয়ে গিয়ে বললেন, খামাখা সময় নষ্ট করলাম, এসব নিশ্চয়ই তৈরি হয়ে গেছে! পুরনো ঢাকায় গেলে হয়তো এখনি দু' ডজন কিনে ফেলা যাবে!

কী বলছেন আপনি? আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, গাছ রোদের দিকে যায় সেটা সবাই জানে। তাই বলে গাছ গাড়ি চালিয়ে নিজে নিজে রোদের দিকে যাচ্ছে সেটা কখনো শুনি নি।

আপনি সত্যি জানেন?

এক শ' বার জানি। এরকম একটা আবিষ্কার হলে আমি জানতাম না? আমি এক ঘন্টা লাগিয়ে রোজ খবরের কাগজ পড়ি।

সফদর আলীর মুষড়ে পড়া ভাবটা কেটে যায় হঠাৎ। চোখ–মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, বলেন, তাহলে এটা তৈরি করা যাক। কী বলেন?

এক শ' বার! আমি হাতে কিল মেরে বললাম, গাড়ি চালিয়ে গাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে

কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় ছবি উঠে যাবে আপনার!

সফদর আলী লাজুক মুখে বললেন, খবরের কাগজে ছবি ছাপিয়ে কী হবে। কিন্তু আপনি যখন বলছেন, তখন তৈরি করা যাক জিনিসটা। খুব সহজ আসলে, আপনাকে বলি কী ভাবে কাজ করবে এটা—

আমি ভয়ে-ভয়ে দেখলাম সফদর আলী কাগজটা টেনে নিচ্ছিলেন আবার, এমন সময় পর্দা ঠেলে জংবাহাদুর এসে ঢুকল। হাতে একটা ট্রে, তার উপর তিন কাপ চা এবং একটি কলা। আমাদের দু'জনের হাতে দুই কাপ চা ধরিয়ে দিয়ে জংবাহাদুর ইজিচেয়ারে তার নিজের চা এবং কলাটি নিয়ে বসে।

সফদর আলী আড়চোখে দেখে বললেন, বেটা কেমন পাজি দেখেছেন? নিজের জন্যে কলা এনেছে, আমাদের জন্যে কিছু না।

আমি হাত নেড়ে বললাম, আহা-হা ছেড়ে দেন, বেচারা একটা বানর ছাড়া তো আর কিছু নয়, চা যে এনেছে এই বেশি।

ভয়ে ভয়ে আমি চায়ে চুমুক দিয়ে হতবাক হয়ে যাই। চমৎকার সুগন্ধী চা, দুধ চিনি মাপমতো, এতটুকু কম-বেশি নেই। বললাম, বাহ্, চমৎকার চা তৈরি করেছে তো!

সফদর আলী চাপা গলায় বললেন, 'আস্তে বলুন, শুনে ফেললে দেমাকে মাটিতে পা ফেলবে না। তারপর গলা আরো নামিয়ে বললেন, এই একটা জিনিস ভালো করে, এছাড়া ভীষণ আলসে।

আমি আড়চোখে জংবাহাদুরকে লক্ষ করি। চোখ আধবোজা করে বসে আছে, এক হাতে ধূমায়িত চা, অন্য হাতে কলা। কলাটা চায়ে ভিজিয়ে-ভিজিয়ে খাচ্ছে, এই দৃশ্য আমি আর কোথায় পেতাম!

সফদর আলীর নতুন আবিষ্কারটি কেমন এগুচ্ছে দেখার জন্যে আজকাল অফিস ফেরত বাসায় যাবার আগে সফদর আলীর বাসা হয়ে যাই। জংবাহাদুরের জন্যে কলাটা-মূলাটা কিনে নিই বলে আজকাল আমাকে দেখলেই চা তৈরি করে আনে। ইদানীং দেখছি আমাকে চায়ের সাথে একটা কলা ধরিয়ে দিচ্ছে। তাকে খুশি করার জন্যে কলাটা চায়ে ভিজিয়ে খেতে হয়, সত্যি কথা বলতে কি, বেশ লাগে খেতে!

সফদর আলী পুরোদমে কাজ করছেন। কলকব্জা বোঝাই ছোট একটা গাড়ি তৈরি হয়েছে, উপরে টব রাখার জায়গা। গাড়ি থেকে লাল আর নীল রঙের দুটি তার বের হয়ে এসেছে। লাল তারটিতে পজিটিভ ভোল্টেজ দিলে গাড়িটা সামনে যায়, নিগেটিভ দিলে পিছনে। নীল তারটিতে পজিটিভ ভোল্টেজ দিলে ডান দিকে, নিগেটিভ দিলে বাম দিকে। আমার সামনেই সফদর আলী পরীক্ষা করে দেখেছেন, গাড়িটা ঠিক ঠিক কাজ করে। এখন একটা ছোট ইলেকট্রনিক্সের বাক্স তৈরি করছেন, গাছ সামনে, পিছনে, ডান বা বাম দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে একটা ছোট সেন্সিং প্রোব এই বাক্সটা দিয়ে কী ভাবে জানি ঠিক তারগুলোতে ঠিক ঠিক ভোল্টেজ হাজির করবে। ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ সহজই মনে হল।

আরো কয়দিন কেটে গেল, সফদর আলী দিন-রাত কাজ করছেন।

ইলেকট্রনিক্সের অংশটুকু জটিল, সবরকম "আই. সি." নাকি এখানে পাওয়া যায় না। তাই দেরি হচ্ছে। "ডিজিটাল" অংশটুকু তৈরি হয়ে গেছে, ওটা নাকি সহজ। "এনালগ" অংশটুকু এখনো শেষ হয় নি। হাই ফ্রিকোয়েন্সির অসিলেশান নাকি ঝামেলা করছে। আমি এসবের মানে বুঝি না, তাই শুধু শুনে যাই।

যেদিন পুরোটা তৈরি হল, আমার উৎসাহ দেখবে কে! একটা মানি প্লান্ট গাছ দিয়েই শুরু করা হল। টবটা ছোট গাড়িটার ওপর তুলে দিয়ে ছোট ছোট সেন্সিং প্রোবগুলো বিভিন্ন পাতায় লাগিয়ে দেয়া হল। চুষনির মতো জিনিস, চাপ দিয়ে ভেতরে বাতাসটা বের করে দিলে বেশ আটকে থাকে। সফদর আলী গাড়িটার ভেতরে দুটো ব্যাটারি ভরে সুইচ অন করতেই গাড়িটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কাঁপতে থাকে, তারপর হঠাৎ একটু সামনে গিয়ে থেমে যায়। খানিকক্ষণ থেমে হঠাৎ পিছিয়ে আসে, তারপর আবার সামনে, তারপর আবার পিছনে।

মিনিট পাঁচেক এরকম করল, সফদর আলী চিন্তিত মুখে তাকিয়ে থাকেন। আমি ইতস্তত করে বললাম, গাছটা মনস্থির করতে পারছে না মনে হচ্ছে। একবার সামনে যাচ্ছে, একবার পিছনে।

উঁহু। সফদর আলী মাথা নাড়েন, আসলে গেইন ঠিক নেই। ফিডব্যাক লুপটা ঠিক করতে হবে। জংবাহাদুর, একটা ছোট স্ক্রু-ড্রাইভার দাও।

জংবাহাদুর টেলিভিশনে একটা প্রচণ্ড মারামারির দৃশ্যে তন্ময় হয়ে ছিল, নেহায়েত অনিচ্ছায় উঠে এসে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার এগিয়ে দেয়। সফদর আলী বললেন, লুপটা ঠিক করতে খানিকক্ষণ সময় লাগবে, আমি তাই জংবাহাদুরের পাশে বসে টেলিভিশন দেখতে থাকি।

রাত দশটার দিকে সফদর আলী ঘোষণা করেন, তাঁর গাছগাড়ি শেষ হয়েছে। জিনিসটা পরীক্ষা করতে গিয়ে আমরা দু'জনেই খেয়াল করলাম এখন রাত। রোদ দিয়ে পরীক্ষা করার কোনো বুদ্ধি নেই। টেবিল ল্যাম্পের আলো দিয়ে পরীক্ষা করে কোনো লাভ হল না। গাছটা কাঁপতে থাকে, কিন্তু আলোর দিকে এগিয়ে না এসে মাঝে-মাঝে বরং একটু পিছিয়েই যাচ্ছিল। ঠিক করা হল, পরদিন রোদ উঠলে পরীক্ষা করা হবে। আমি ভোরেই চলে আসব, কাল এমনিতেই আমার অফিস নেই।

পরদিন ভোরে নাস্তা করেই আমি সফদর আলীর বাসায় হাজির হই। বেশ রোদ উঠেছে। গাছগাড়ি পরীক্ষা করায় অসুবিধে হবার কথা নয়। সফদর আলীকে দেখে একটু ঘাবড়ে গেলাম, মুখ গম্ভীর এবং ভুরু কুঁচকে নিজের গোঁফ টানছেন। বোঝাই যাচ্ছে জিনিসটা ঠিক কাজ করে নি। ঘরের এক কোনায় গাছটা গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, অন্যদিকে জানালা খোলা, রোদ এসে পড়েছে ঘরের মেঝেতে। আমি ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী হল সফদর সাহেব?

আপনি নিজেই দেখুন, বলে সফদর আলী উঠে দাঁড়ান। জানালাটা বন্ধ করে প্রথমে ঘরটা অন্ধকার করে দিলেন। তারপর গাছগাড়িটাকে ঠেলে এনে ঘরের মাঝখানে রাখলেন। এবারে জানালাটা খুলে দিতেই ঘরে রোদ এসে পড়ল। সাথে সাথে গাড়িটা ঘরঘর শব্দ করে পিছিয়ে যেতে থাকে। সফদর আলী জানালাটা বন্ধ করে দিলেন।

সাথে সাথে গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। আবার জানালাটা খুলে দিলেন, গাড়িটা আবার রোদ থেকে সরে যেতে থাকে। আশ্চর্য ব্যাপার! আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম, গাছটা গাড়ি চালাচ্ছে।

কিন্তু ভুল দিকে চালাচ্ছে, রোদের দিকে না গিয়ে রোদ থেকে সরে যাচ্ছে।

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, তাতে কী আছে? আপনার সেই লাল তারের ভোল্টেজটা পাল্টে দিলে হয়। যখন পজিটিভ হওয়ার কথা তখন নিগেটিভ, যখন নিগেটিভ হওয়ার কথা তখন পজিটিভ। তা হলেই যখন পিছন দিকে যাচ্ছে তখন—

ছোট বাচ্চারা অর্থহীন কোনো কথা বললে বড়রা যেভাবে তার দিকে তাকায়, সফদর আলী ঠিক সেভাবে আমার দিকে তাকালেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, বিজ্ঞান মানে কি?

আমি হঠাৎ এরকম গুরুতর প্রশ্ন শুনে থতমত খেয়ে থেমে গেলাম। সফদর আলী আহত গলায় বললেন, কোনো একটা জিনিসকে অন্ধের মতো কাজ করানো তো বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞান হচ্ছে বোঝা ব্যাপারটা কী হচ্ছে, বুঝে তারপর কাজ করা। বোকার মতো ভোল্টেজ পাল্টে দিলেই তো হয় না, তাহলে সেটা তো আর বিজ্ঞান থাকে না, সেটা তাহলে জাদু হয়ে যায়।

এরকম একটা অবৈজ্ঞানিক কথা বলার জন্যে লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল, আমি তাঁর কথাগুলো হজম করে মাথা নিচু করে বসে রইলাম। সফদর আলী বিজ্ঞান এবং মানুষের প্রকৃতির ওপর ছোটখাট একটা বক্তৃতা দিয়ে আবার গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলেন। আমি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বিকেলের দিকে আবার আসব বলে উঠে এলাম। আজ আবার বাজার করার কথা, দেরি হলে কিছু আর পাওয়া যাবে না।

বিকেলে সফদর আলীর বাসায় পৌঁছে দেখি বাসা একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। সারা ঘরে ভাঙা পেয়ালা, পিরিচ, বাসনকোসন, বইপত্র ছড়ানো, চারদিকে পানি থৈথৈ করছে। ঘরে ছড়ানো-ছিটানো অসংখ্য মারবেল, এক কোনায় একটা বড় তক্তা। আমাকে দেখে সফদর আলী হৈহৈ করে উঠলেন। বের করে ফেলেছি সমাধান।

কিসের সমাধান?

গাছগাড়ি উল্টোদিকে যাচ্ছিল কেন।

সত্যি? আমি সাবধানে ঘরের মাঝে এসে দাঁড়ালাম, কেন যাচ্ছিল উল্টোদিকে?

আপনাকে চাক্ষুষ দেখাই, বলে তিনি উপরের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার দেন, নিচে নেমে আস, জংবাহাদুর!

আমি উপরে তাকিয়ে হতবাক হয়ে যাই, জংবাহাদুর বাসার ঘুলঘুলি ধরে ঝুলে আছে।

নেমে আস বলছি।

জংবাহাদুর নেমে আসার কোনো লক্ষণ দেখাল না, বরং কুঁই কুঁই করে প্রতিবাদ করে কী একটা বলল।

নেমে আস, এছাড়া তোমার টেলিভিশন দেখা বন্ধ।

জংবাহাদুর তবু নেমে আসল না। দেখে বুঝতে পারি ব্যাপার গুরুতর। আমি ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী দেখাতে চাইছেন?

জংবাহাদুর নেমে না এলে দেখাই কেমন করে? সফদর আলী এদিকে সেদিকে

তাকাতে তাকাতে হঠাৎ ঘুরে আমার দিকে তাকান, তাঁর চোখ–মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, হাতে কিল মেরে বললেন, এই তো আপনি আছেন, আপনি দেখাতে পারবেন।

যে জিনিস জংবাহাদুর করতে চাইছে না সেটা আমি গলা বাড়িয়ে করতে যাব, এত বোকা আমি নই, কিন্তু কিছু বলার আগেই দেখি সফদর আলী ঘরে ছড়ানো–ছিটানো মারবেলগুলো একত্র করে তার ওপরে তক্তাটা বসিয়ে আমাকে টেনে–হিঁচড়ে তার ওপর তুলে ফেলেছেন।

তক্তার নিচে মারবেলগুলো কাজ করছে বল বিয়ারিঙের মতো। সাবধানে আমাকে ধরে রেখে সফদর আলী বললেন, তক্তাটি এখন খুব সহজে গড়িয়ে যাবে, কাজেই আপনি সাবধানে নড়াচড়া করবেন।

আমি চিৎকার করে নেমে পড়তে যাব, তার আগেই সফদর আলী আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, সাবধান! একটু অসাবধান হলেই কিন্তু আছড়ে পড়বেন।

আমি নাক–মুখ খিঁচিয়ে কোনোমতে তক্তার উপরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। মনে হয় পায়ের নিচে পৃথিবী টলটলায়মান। একটু অসতর্ক হলেই একেবারে পপাত ধরণীতল! সফদর আলী কোথা থেকে একটা কলা তুলে নিয়ে আমার নাকের সামনে ঝুলিয়ে ধরে বললেন, মনে করুন আপনি জংবাহাদুর।

ব্যাপারটা সহজ নয়, তবু চেষ্টা করলাম।

এবারে কলাটা নেয়ার জন্যে এগিয়ে আসুন।

আমি কলাটি ধরার জন্যে একটু এগুতেই শরীরের ওপরের অংশ সামনে ঝুঁকে এল, ম্যাজিকের মতো নিচের অংশ গেল পিছিয়ে। আমি তক্তার ওপর তাল সামলানোর জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকি, কিন্তু কিছু বোঝার আগে আমাকে নিয়ে তক্তা মারবেলের উপর প্রচণ্ড বেগে পিছনে গড়িয়ে যায়। আমি হাতের কাছে যা আসে তাই ধরার চেষ্টা করতে থাকি। একটা ছোট আলমারি ছিল, তাই ধরে ঝুলে পড়লাম। কিন্তু লাভ হল না, আলমারিসহ প্রচণ্ড জোরে মেঝেতে আছড়ে পড়ি। মনে হল শরীরের সব হাড়গোড় ভেঙে গেছে, নাড়িভুঁড়ি ফেঁসে গেছে, ঘিলু মাথা ফেটে বের হয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে গেছে। চোখের সামনে নানা রঙের আলো খেলা করতে থাকে। হলুদ রঙের প্রাধান্যই বেশি। প্রথমে ভাবলাম, আমি বোধহয় মরেই গেছি, সাবধানে চোখ খুলে দেখি মরি নি, কারণ জংবাহাদুর ঘুলঘুলিতে ঝুলে থেকেই পেট চেপে ধরে প্রচণ্ড হাসিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। মনে হল বোধহয় মরে গেলেই ভালো ছিল। তাহলে অন্তত এই দৃশ্যটি দেখতে হত না, চোখ বন্ধ করে ফেললাম উপায় না দেখে। আবার যখন চোখ খুললাম, দেখি মুখের উপর সফদর আলী ঝুঁকে আছেন। শুনলাম তিনি বলছেন, দেখলেন? আপনি সামনে আসার চেষ্টা করছিলেন আর কেমন পিছিয়ে গেলেন! গাছের বেলাতেও একই ব্যাপার, যাকে বলে ভরবেগের সাম্যতা! গাছ চেষ্টা করে সামনে আসতে, কিন্তু যায় পিছিয়ে।

আমি আবার চোখ বন্ধ করে ফেলি, এবারে আর কোনো সন্দেহ থাকে না যে মরে গেলেই ভালো ছিল।

সে রাতে যখন বাসায় ফিরেছি, তখন আমার কপালে এবং হাতে ব্যান্ডেজ। একটা চোখ বুজে আছে, সেটা দিয়ে আপাতত কিছু দেখা যাচ্ছে না। হাঁটতে হচ্ছে খুঁড়িয়ে।

কারণ কোমর, হাঁটু এবং গোড়ালিতে প্রচণ্ড ব্যথা।

আমাকে দেখে মা আঁৎকে উঠলেন, সে কী! এ কী চেহারা তোর, অ্যাকসিডেন্ট নাকি?

না, অ্যাকসিডেন্ট না।

তাহলে? মারামারি করেছিস নাকি?

মারামারি করব কেন?

নিশ্চয়ই করেছিস, তা ছাড়া এরকম চেহারা হবে কেন?

বললাম তো মারামারি করি নি।

আবার মিথ্যা কথা বলছিস! এই বয়সে রাস্তায় মারপিট করে এসে আবার আমার সাথে মিথ্যা কথা বলিস?

বললাম তো মারপিট করি নি।

আমার কথা মা শুনলেন না। চোখে আঁচল দিয়ে বললেন, আমি কোথায় যাই গো! এরকম একটা খুনে ছেলেকে পেটে ধরেছি! তোর নানা কত বড় খান্দানী বংশের লোক, আর তার নাতি রাস্তায় গুণ্ডাদের সাথে মারপিট করে আসে—

সফদর আলীর বাসায় সেই রাম আছাড় খাবার পর প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এখন থেকে কোনো অবস্থাতেই আর তাঁর বাসায় যাচ্ছি না। দেখা করতে হলে চায়ের দোকানে দেখা–সাক্ষাৎ কথাবার্তা হবে। বিজ্ঞানীরা বড় ভয়ংকর জিনিস, তাদের সাথে আর হাতেকলমে কোনো কাজকর্ম নেই।

সপ্তাহখানেক কেটে গেল, চোখের ফোলা কমেছে। হাত দিয়ে জিনিসপত্র ধরা শুরু করেছি। কোমরের ব্যথাটা এখনো আছে, ডাক্তার বলেছে সারতে সময় নেবে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। অফিসে সেকশান অফিসার বললেন, শেয়ালের মাংস খেলে নাকি ব্যথা–বেদনা ভালো হয়ে যায়। আর কয়দিন অপেক্ষা করে হয়তো শেয়াল ধরতে বের হতে হবে। অফিস ফেরত কয়দিন কাওরান বাজারে সেই চায়ের দোকানে ঢুঁ মেরে গেছি, সফদর আলীর দেখা পাই নি। তাঁর গাছগাড়ির কী হল জানার কৌতূহল হচ্ছিল কিন্তু বাসায় যাওয়ার ভরসা পাচ্ছি না।

দু'সপ্তাহের মাথায় সফদর আলীর সাথে দেখা। আমি চা খেয়ে বের হচ্ছিলাম, দেখি তিনি হেলতে–দুলতে ঢুকছেন। আমাকে দেখে খুব খুশি হয়ে উঠলেন, এই যে আপনাকে পাওয়া গেছে, কতদিন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। বলুন দেখি, কোন গাছ পোকা খায়?

পোকা খায়? গাছ?

হ্যাঁ, অনেকরকম গাছ পোকা ধরে খায়, জানেন না?

আমার মনে পড়ল কোথায় জানি পড়েছিলাম যে, কিছু কিছু গাছ নাকি পোকা ধরে খায়। একটা গল্পও পড়েছিলাম যে মাদাগাস্কার দ্বীপে একটা গাছ নাকি মানুষ ধরে খেয়ে ফেলত। আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ, শুনেছি কিছু গাছ নাকি পোকা খায়, কিন্তু সেরকম গাছ তো চিনি না।

তামাক গাছ নাকি পোকা খায়?

তাই নাকি, জানতাম না তো!

banglabook.com

সফদর আলী চিন্তিত মুখে বললেন, একটা পোকা-খাওয়া-গাছ খুঁজে বেড়াচ্ছি। সবচেয়ে ভালো হয় যদি একটা "ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপ" পেয়ে যাই। ওটা একেবারে মাছিটাছি ধরে খেয়ে ফেলে।

কী করবেন ওরকম গাছ দিয়ে?

এখন গাছ গাড়ি চড়ে গান শুনতে যায়, রোদ পোহাতে যায়, পানি খেতে যায়, যদি "ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপ" পাই—

কী বললেন? আমি চমকে উঠে বললাম, গাছগাড়ি চড়ে কী করে?

কেন? গান শোনে, রোদ পোহাতে যায়, পানি খেতে যায়।

গান শোনে?

হ্যাঁ। এত অবাক হচ্ছেন কেন? আপনি দেখলেন না?

কোথায় দেখলাম?

হঠাৎ সফদর আলীর সবকিছু মনে পড়ে যায়। মাথা নেড়ে বললেন, সেদিন পড়ে গিয়ে ব্যথা পাওয়ার পর তো আপনি আর আসেন নি। বেশি ব্যথা পেয়েছিলেন নাকি?

সফদর আলীর উপর রাগ করে থাকাও মুশকিল। চেপে থাকার চেষ্টা করলাম, তবু গলার স্বরে একটু রাগ প্রকাশ হয়ে গেল, না ব্যথা পাব কেন? বয়স্ক এক জন মানুষ যদি ওভাবে দড়াম করে পাকা মেঝেতে আছড়ে পড়ে, ব্যথা পাবে কেন?

সফদর আলী অপরাধীর মতো মুখ করে বললেন, আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। কিন্তু পরে হিসাব করে দেখেছিলাম ওরকম হাবড়ে পড়ে সারা শরীরে ব্যথাটা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বলে বেঁচে গিয়েছিলেন। পুরো চোটটা যদি এক জায়গায় লাগত তাহলে হাড় ভেঙে যেতে পারত।

আমি রাগ লুকানোর কোনো চেষ্টা না করে বললাম, আর ঐ বজ্জাত বানরটা কেমন পেট চেপে ধরে হাসা শুরু করেছিল দেখেছিলেন?

সফদর আলী মাথা নেড়ে বললেন, ওটা আমার দোষ। বানরকে হাসতে শেখানোর কোনো দরকার ছিল না, এখন যখন খুশি হাসতে থাকে। ভদ্রতাজ্ঞানটুকু নেই। আপনি যে আছাড় খেয়ে পড়লেন, দেখে যত হাসিই পাক, জংবাহাদুরের মোটেই হাসা উচিত হয় নি। আমি কি হেসেছিলাম?

আমি স্বীকার করলাম তিনি হাসেন নি। যাই হোক, আমার কৌতূহল আর বাঁধ মানছিল না। জিজ্ঞেস করলাম, গাছগাড়ির কী হল, বলুন।

সফদর আলী সবকিছু খুলে বললেন। সার্কিটের কানেকশান একটু পরিবর্তন করে দেয়ার পর গাছগাড়ি ঠিক ঠিক কাজ শুরু করেছে। ভোরে রোদ উঠতেই গাছটা রোদে হাজির হয়, আবার রোদটা বেড়ে গেলে রোদ থেকে ছায়ায় সরে যায়। ঘরের এক কোনায় একটু পানি ছেড়ে রেখেছিলেন। গাছ কী ভাবে কী ভাবে সেটা বুঝে নিয়ে দিনে এক বার পানির নিচে গিয়ে দাঁড়ায়। কোথায় নাকি পড়েছিলেন যে গাছের সাথে কথা বললে নাকি গাছ ভালো থাকে। সফদর আলী কী নিয়ে কথা বলবেন ভেবে পান নি বলে একটা রেকর্ড প্লেয়ারে কিছু গানের ব্যবস্থা করেছেন। গাছটা আজকাল নাকি রীতিমতো গান শুনছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের দিকে নাকি গাছটার বিশেষ আকর্ষণ। একটা রেকর্ড চাপিয়ে দিলেই গাছ নাকি পড়িমরি করে ছুটে আসে। সফদর আলী আরো গোটা দশেক গাছগাড়ি তৈরি করে ভিন্ন ভিন্ন গাছ বসিয়ে, দেখতে চান কোনটা কী রকম

কাজ করে। তাঁর বিশেষ ইচ্ছা কোন গাছ কী গান শুনতে পছন্দ করে সেটা বের করা। তিনি নাকি "গাছের সংগীতচর্চা" নাম দিয়ে একটা বই লিখবেন বলে ঠিক করেছেন। আমার পরিচিত কোনো প্রকাশক আছে কি না জানতে চাইলেন। তিনি পোকা খেতে পছন্দ করে এরকম একটা গাছ খুঁজছেন, তাহলে সেই গাছগাড়িতে পোকা মারার একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। গাছটা তাহলে পোকা মেরে খেতে পারবে। ঘরে তেলাপোকার উপদ্রব থাকলে তো কথাই নেই, একদিনে ঘর পরিষ্কার হয়ে যাবে।

সফদর আলীর গাছগাড়ি দেখার কৌতূহল আর আটকে রাখা যাচ্ছিল না। আজ অনেক রাত হয়ে গেছে। তাই ঠিক করা হল পরদিন বিকেলে আলো থাকতে থাকতে তাঁর বাসায় যাব। গাছপালা ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, আলো ও পানি খুঁজে নিচ্ছে, গান শুনছে—এর থেকে বিচিত্র জিনিস আর কী হতে পারে!

পরদিন বিকালে সফদর আলীর বাসায় গিয়ে দেখি বাসা বাইরে থেকে তালাবন্ধ, ঘরের দরজায় একটা খাম, খামের উপরে আমার নাম লেখা। ভিতরে একটা চিঠি, চিঠিটা এরকম :

সুসংবাদ। ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপ। জরুরি। চট্টগ্রাম। উদ্ভিদবিদ্যা প্রফেসর। দুঃখিত।

টেলিগ্রাম করে করে তাঁর স্বাভাবিক চিঠি লেখার ক্ষমতা চলে গেছে। তবু বুঝতে অসুবিধে হল না। চট্টগ্রামের কোনো এক উদ্ভিদবিদ্যার প্রফেসর ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপ নামের পোকা-খাওয়া-গাছ জোগাড় করে দেবেন বলে তাঁকে তাড়াহুড়ো করে চলে যেতে হয়েছে। আমার সাথে দেখা হল না বলে দুঃখিত। আমি একটু নিরাশ হলাম, কিন্তু খুশিও হলাম, সেদিন যেভাবে ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপের জন্যে হা-হুতাশ করছিলেন যে আমার বেশ খারাপই লাগছিল।

তারপর বেশ কয়দিন সফদর আলীর খোঁজ নেই। তিনি ফিরে এসেছেন কি না জানি না। বাসায় গিয়ে খোঁজ নেব ভাবছিলাম। কিন্তু কাজের চাপে সময় পাচ্ছি না। তার মধ্যে হঠাৎ একদিন টেলিগ্রাম এসে হাজির :

ডজন। ভিনাস। হাই ভোল্টেজ।

প্রথম অংশটা বুঝতে পারলাম। তিনি এক ডজন ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপ গাছ পেয়েছেন, কিন্তু হাই ভোল্টেজ কথাটি দিয়ে কী বোঝাতে চাইছেন ধরতে পারলাম না। যাই হোক, দেরি না করে সেদিনই আমি সফদর আলীর বাসায় গিয়ে হাজির। জংবাহাদুর দরজা খুলে আমাকে সফদর আলীর কাছে নিয়ে গেল। তিনি তাঁর ঘরে অসংখ্য যন্ত্রপাতির মাঝে উবু হয়ে বসে ছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, ইকবাল সাহেব, দেখে যান কী পেয়েছি।

একটু এগিয়ে দেখি ছোট ছোট বারটা টবে ছোট ছোট বারটা গাছ। গাছের পাতাগুলো ভারি অদ্ভুত, চারদিকে কাঁটার মতো বেরিয়ে আছে। কোনো কোনো পাতা খোলা, কোনো কোনোটা বন্ধ হয়ে আছে। আমি বললাম, এই কি সেই ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপ?

হ্যাঁ, দেখুন মজা দেখাই।

সফদর আলী টেবিলে রাখা কাঁচা মাংসের খানিকটা কিমা থেকে একটু তুলে নিয়ে গাছের পাতার ওপর ছেড়ে দিলেন। আর কী আশ্চর্য, গাছের পাতাটা ভাঁজ হয়ে বন্ধ হয়ে মাংসটুকু ঢেকে ফেলল! সফদর আলী বললেন, যখন পাতাটা খুলবে, দেখবেন মাংসটুকু নেই।

কখন খুলবে?

সময় লাগবে, মাংস হজম করা তো সহজ নয়।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, দুনিয়াতে কত কী যে দেখার আছে, একটা জীবনে তার কতটুকু মাত্র দেখা যায়?

সফদর আলী বললেন, আপনার কাজ না থাকলে সবগুলো গাছকে একটু করে কিমা খাওয়ান দেখি।

যদিও জানি ছোট এইটুকু গাছে ভয় পাবার কিছু নেই, তবু আমার একটু ভয় ভয় লাগতে থাকে। সাবধানে আমি একটু একটু করে কিমা গাছগুলোকে খাওয়াতে থাকি। পাতার ওপরে রাখতেই পাতাটা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায়। সফদর আলী খানিকক্ষণ আমাকে লক্ষ করে আবার যন্ত্রপাতির ভেতর মাথা ঢুকিয়ে দিচ্ছিলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন সেখানে লিখেছেন, হাই ভোল্টেজ, সেটার মানে কি?

সফদর আলী একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন, বলেন, বুঝতে পারেন নি?

নাহ্! আমার একটু লজ্জাই লাগে স্বীকার করতে।

আপনাকে বলেছি না ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপ, যে গাছগাড়িতে থাকবে সেখানে পোকা মারার ব্যবস্থা থাকবে।

বলেছিলেন। কী ভাবে পোকাগুলোকে মারবে?

হাই ভোল্টেজ দিয়ে।

ও।

একটা লম্বা তার বেরিয়ে আসবে। তারের মাথায় থাকবে বিশ হাজার ভোল্ট। পোকা-মাকড়ের গায়ে লাগতেই প্রচণ্ড স্পার্ক, আর সেটা এসে পড়বে ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপের উপর, ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপ তখন কপ কপ করে সেটা খেয়ে নেবে।

দৃশ্যটা কল্পনা করেই আমার গায়ে কেমন জানি কাঁটা দিয়ে ওঠে। আলোচনার বিষয়বস্তু পাল্টানোর জন্যে বললাম, আপনার গাছগাড়ি কই? বলছিলেন যে গান শুনতে যায়, দেখাবেন একটু?

সফদর আলী অপ্রতিভের মতো বললেন, ঐ যা! হাই ভোল্টেজের ব্যবস্থা করার জন্যে সবগুলো খুলে ফেলেছি।

তাকিয়ে দেখি বেশ কয়টা গাছগাড়ি, সবগুলোই খোলা। সফদর আলী ভেতরে এখন যন্ত্রপাতি ভরছেন। স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে কী একটা জিনিস চেপে ধরে বললেন, আর একটু অপেক্ষা করুন, দেখবেন এগুলো পোকা-মাকড় ধরে বেড়াবে, গান শোনা থেকে সেটা বেশি মজার।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কতক্ষণ লাগবে?

এই তো ঘন্টাখানেকের মধ্যে একটা দাঁড়িয়ে যাবে।

কিন্তু ঘন্টাখানেকের মধ্যে জিনিসটা দাঁড় হল না। প্রচণ্ড হাই ভোল্টেজের স্পার্ক হতেই সেটা ইলেকট্রনিক সার্কিটের অনেক জায়গায় কী ভাবে জানি ঝামেলা করে ফেলছিল। মাইক্রোপ্রসেসরে ভুল পাল্‌স্ এসে সেটাকে নাকি বিভ্রান্ত করে দেয়, কাজেই পুরো সার্কিটটাকে নাকি খুব ভালো করে "শিল্ডিং" করতে হবে। সফদর আলী সবকিছু খুলে আবার একেবারে গোড়া থেকে শুরু করলেন, ধৈর্য আছে বটে! আমি আর বসে থেকে কী করব, বাসায় ফিরে এলাম।

বেশ কয়দিন কেটে গেছে, আমি মাঝে মাঝেই খোঁজ নিই। কিন্তু কিছুতেই সফদর আলীর কাজ শেষ হয় না। যখন শুনি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন হঠাৎ করে একটা হাই ভোল্টেজের স্পার্ক আরেকটা ট্রানজিস্টর না হয় আরেকটা আই. সি.-কে পুড়িয়ে দেয়। সফদর আলী তখন আবার একেবারে গোড়া থেকে শুরু করেন। দেখে-দেখে আমি প্রায় হাল ছেড়ে দিলাম, তখন আবার আমাকে কয়দিনের ছুটি নিতে হল। মা অনেক দিন থেকে বলছেন নেত্রকোনা যাবেন, তাঁকে নিয়ে যাবার লোক নেই। কাজেই প্রায় সপ্তাহখানেক নেত্রকোনায় থেকে যখন ফিরে এসেছি, তখন দেখি আমার নামে বেশ কয়েকটা টেলিগ্রাম, বাসার সবাই সেগুলো খুলে পড়েছে। টেলিগ্রাম হলেই জরুরি খবর ভেবে সেগুলো খুলে ফেলা হয়। টেলিগ্রামগুলো এরকম—

প্রথমটি : কাজ শেষ।
দ্বিতীয়টি : কাজ শেষ। আসুন এবং দেখুন। হিন্দি গান।
তৃতীয়টি : কাজ শেষ। আসুন এবং দেখুন। বীভৎস।
চতুর্থটি : জরুরি। রাজশাহী। পিচার প্লান্ট।

বাসার কেউ টেলিগ্রামগুলো পড়ে কিছু বোঝে নি এবং সেটা নিয়ে বেশি মাথাও ঘামায় নি, সবাই জেনে গেছে আমার একজন আধপাগল বন্ধু আছে, সে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে শুধু টেলিগ্রাম পাঠায়। আমার অবশ্যি টেলিগ্রামগুলো বুঝতে কোনো অসুবিধে হল না, ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপ বসিয়ে গাড়ি বানানো শেষ হয়েছে, সফদর আলী আমাকে গিয়ে দেখতে বলেছেন। গাছগুলো নিশ্চয়ই হিন্দি গান শুনতে পছন্দ করে এবং যেভাবে পোকা ধরে খাচ্ছে, ব্যাপারটা হয়তো বীভৎস। শেষ টেলিগ্রাম পড়ে মনে হল তিনি জরুরি কাজে রাজশাহী যাচ্ছেন। পিচার প্লান্ট কথাটার অর্থ ঠিক ধরতে পারলাম না। ডিকশনারি খুলে দেখলাম এটি আরেকটি পোকা—খেকো গাছ। গাছের পাতার নিচে একটা ছোট কলসির মতো থাকে, সেখানে এক ধরনের রস থাকে। পোকা-মাকড় তার লোভে কলসির ভেতরে ঢুকে পড়ে, তখন গাছ কলসির মুখ বন্ধ করে ফেলে। মুখ আবার যখন খোলে তখন ভেতরের পোকা হজম হয়ে গেছে। টেলিগ্রামের পুরো অর্থ এবারে বুঝতে পারলাম। রাজশাহীতে নিশ্চয়ই তিনি এধরনের কোনো গাছের সন্ধান পেয়ে জরুরি নোটিশে চলে গেছেন। সফদর আলী এখানে নেই জেনেও একদিন তাঁর বাসা থেকে ঘুরে এলাম। ঘর তালাবন্ধ। কিন্তু ভেতরে মনে হল খুটখাট শব্দ হচ্ছে। জংবাহাদুরের কুঁই কুঁই আওয়াজও মনে হল শুনলাম কয়েক বার। এদিক-সেদিক দেখে উৎসাহজনক বা সন্দেহজনক কিছু না পেয়ে বাসায় ফিরে

banglabook.com

এলাম।

আরো কয়দিন পরের কথা। আমি অফিসে কাজ করতে করতে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি। ছুটির সময় প্রায় হয়ে এসেছে। এমন সময় শুনি বাইরে সফদর আলীর গলার স্বর। সেক্রেটারির কাছে আমার খোঁজ করছেন। আমি অবাক হয়ে বেরিয়ে এলাম, সফদর আলীকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে। আমাকে দেখে যেন আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার সফদর সাহেব? কবে এলেন?

এই তো, একটু আগে। তারপর গলা নামিয়ে বললেন, আপনাকে আমার সাথে যেতে হবে।

কেন? কী হয়েছে?

জানি না। স্টেশন থেকে বাসায় পৌঁছে যেই দরজা খুলেছি, চিৎকার করতে–করতে জংবাহাদুর বেরিয়ে এসে বাসার কার্নিশে উঠে গিয়ে বসে পড়ল। আমি যতই ডাকি, কিছুতেই নিচে নামতে চায় না। ভেতরে কিছু একটা দেখে ভয় পেয়েছে।

কী দেখে?

বুঝতে পারলাম না, ভয় পাবার মতো কিছু তো নেই বাসায়।

আমি একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলাম, ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপগুলো?

সেগুলোতে ভয় পাবার কী আছে? যেভাবে পোকা মারে, দেখে একটু ঘেন্না ঘেন্না লাগে। কিন্তু ভয় পাবার তো কিছুই নেই।

এখন কী করতে চান?

বাসায় জিনিসগুলো রেখে কোনোমতে চলে এসেছি। আপনাকে নিয়ে এখন যাব। একা একা যেতে সাহস পাচ্ছি না।

অফিস প্রায় ছুটি হয়েই গেছে, আমি কাগজপত্র গুছিয়ে সফদর আলীর সাথে বেরিয়ে পড়লাম। সফদর আলী জানালেন, রাজশাহী গিয়ে কোনো লাভ হয় নি। যে বলেছিল তাঁকে পিচার প্লান্ট জোগাড় করে দেবে, সে জোগাড় করে দিতে পারল না। সেখানে শুনলেন, বগুড়াতে এক নার্সারিতে নাকি আছে। সেখানে গিয়েও পেলেন না। ঘোরাঘুরিই হয়েছে, কোনো কাজ হয় নি।

রিকশা করে তাঁর বাসায় পৌঁছুতে–পৌঁছুতে প্রায় ঘন্টাখানেক লেগে গেল। শীতের বিকেল, রোদ পড়ে আসছে দ্রুত। বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গিয়েছে। এক সোয়েটারে শীত মানতে চায় না। সফদর আলীর বাসার সামনে দেখলাম একটা ছোটখাট ভিড়। বুঝতে অসুবিধে হল না ভিড়টি জংবাহাদুরের সৌজন্যে। লোকজনের ভিড় দেখলে জংবাহাদুর যে নিজে থেকেই খেলা দেখাতে শুরু করে, সেটা শিখেছি অনেক মূল্য দিয়ে। আজ অবশ্যি সেরকম কিছু নয়। জংবাহাদুরের মেজাজ–মরজি সুবিধের নয়, উপস্থিত লোকজনকে মাঝে–মাঝে ভেংচি কাটা ছাড়া আর কিছুতেই উৎসাহ নেই। উপস্থিত লোকজন অবশ্যি তাতেই খুশি। আমাদের দেখে সে দাঁত–মুখ খিঁচিয়ে কী–কী বলতে শুরু করে। বানরের ভাষা আছে কি না কে জানে, থাকলেও সেটা আমাদের জানা নেই। কাজেই জংবাহাদুর ঠিক কী বলতে চাইছে বুঝতে পারলাম না। আমরা যখন দরজা খুলে ঢুকব, তখন সে প্রবল বেগে মাথা নেড়ে নিষেধ করতে থাকে। কিন্তু বানরের কথা শুনে তো আর জগৎসংসার চলতে পারে না। আমরা তাই তালা খুলে সাবধানে ঘরের

ভেতরে ঢুকলাম। ভেতরে আবছা অন্ধকার, ভালো করে দেখা যায় না। সফদর আলী হাততালি দিতেই বাতি জ্বলে উঠল। আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, অন্ধকারে সবসময় সুইচ খুঁজে পাওয়া যায় না, তাই এই ব্যবস্থা। শব্দ দিয়ে সুইচ অন করা।

ঘরের ভিতর ছড়ানো-ছিটানো জিনিসপত্র, এছাড়া আর কোনো বিশেষত্ব নেই। বোঝা যায় এটা জংবাহাদুরের ঘর। পাশের ঘরে একটু খুটখাট শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওঘরে কি ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপগুলো?

হ্যাঁ, চলুন যাই।

আমার একটু ভয় ভয় লাগতে থাকে। বললাম, লাঠিসোঁটা কিছু একটা নিয়ে গেলে হয় না?

সফদর আলী কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়েও কী মনে করে একটা লোহার রড তুলে নিলেন। আমরা দু'জন পা টিপে-টিপে পাশের ঘরে এসে ঢুকলাম। ঘরে কিছু নেই, আবছা অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না। সফদর আলী হাততালি দিলেন, কিন্তু বাতি জ্বলল না। আবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু লাভ হল না। আমিও চেষ্টা করি, কিন্তু বাতি আর জ্বলল না। সফদর আলী চিন্তিত মুখে বললেন, আবার বাল্‌বটা ফিউজ হয়েছে।

আমি অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার ভিনাস ফ্লাই ট্র্যাপগুলো কোথায়?

ঐ তো। সফদর আলী হাত দিয়ে দেখিয়ে দেন। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, আমাদের ঘিরে দেয়াল ঘেঁষে চারদিকে গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে। বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু দেখেই আমার মনে হল সবগুলো বাজে মতলব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলাম, ওভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

কী জানি! সার্কিট কেটে গেছে হয়তো—সফদর আলীর কথা শেষ হবার আগেই ডানপাশে একটা গাছগাড়িতে দুটো বাতি জ্বলে ওঠে। শুধু তাই নয়, বাতি দুটি পিটপিট করতে থাকে। দেখে মনে হয় এক জোড়া চোখ। আমি আঁৎকে উঠে বললাম, ওটা কি?

বাতি।

চোখের মতো লাগছে দেখি, পিটপিট করছে কেন?

না, চোখ নয়। পোকা-মাকড় আলো দেখলে এগিয়ে আসে। তাই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম, গাছগাড়ি পোকা-মাকড় ধরতে হলে বাতি জ্বালিয়ে নেয়।

কিন্তু দেখুন আপনি, কেমন পিটপিট করছে, ঠিক চোখের মতো।

সফদর আলী দুর্বলভাবে হেসে বললেন, ঠাট্টা করে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম, দেখতে চোখের মতো দেখায় কিনা!

ঠিক এই সময় চোখ জোড়া ঘুরে আমাদের ওপর এসে পড়ে। আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠি, আমাদের উপর আলো ফেলছে কেন?

কী জানি! আমাদের পোকা ভাবছে নাকি?

আমি ভয়ে-ভয়ে ভাঁটার মতো চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে থাকি। হঠাৎ দেখি সেটা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমি ফিসফিস করে বললাম, সফদর সাহেব, চলুন পালাই।

banglabook.com

ভয়ের কী আছে! একটা গাছই তো।

আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে কেন? আমার গলার স্বর কেঁপে ওঠে। খেয়ে তো ফেলতে পারবে না—সফদর আলী সাহস দেয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু গলার স্বরে বোঝা গেল তিনি নিজেও একটু ভয় পেয়েছেন। গাছটা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। আমি খেয়াল করলাম, ওটার সামনে দিয়ে শুঁড়ের মতো কী একটা যেন বের হয়ে আছে। ফুট চারেক উঁচু। সেটা দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, শুঁড়ের মতো ওটা কি?

সফদর আলী ঢোক গিলে বললেন, ওটা ইলেকট্রিক শক দিয়ে পোকা মারার জন্যে। ওটাতেই হাই ভোল্টেজ।

ওটা বের করে এগিয়ে আসছে কেন?

মনে হয় আমাদের শক মারতে চায়।

সর্বনাশ! আমি আঁৎকে উঠে বললাম, চলুন পালাই।

চলুন। সফদর আলী হঠাৎ করে রাজি হয়ে গেলেন। আমরা দু'জন ঘুরে দাঁড়াই, দরজার দিকে এগুতেই হঠাৎ আমাদের চক্ষু স্থির হয়ে গেল, দুটি গাছ গুটি গুটি দরজার সামনে এগিয়ে এসেছে। আমরা ঘুরতেই তাদের ভাঁটার মতো দুটি চোখ জ্বলে উঠল। শুধু তাই নয়, ইলেকট্রিক শক দেয়ার শুঁড়টা দোলাতে দোলাতে আস্তে আস্তে এগুতে থাকে। আমি সফদর আলীর দিকে তাকালাম, এখন?

সফদর আলী মাথা চুলকে বললেন, বাম দিকে চেষ্টা করি, ঐ জানালার ওপরে উঠে—

চেষ্টা করার আগেই বাম দিকে, ডান দিকে, সামনে, পিছনে গাছগুলোর চোখ জ্বলে উঠতে থাকে। আমরা চারদিক দিয়ে ঘেরাও হয়ে গেলাম। এবারে গাছগুলো শুঁড় দুলিয়ে আস্তে-আস্তে এগুতে থাকে। হঠাৎ হঠাৎ একটা দুটি শুঁড় থেকে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে আসে।

ভয়ে আমার হৃৎস্পন্দন থেমে যাবার মতো অবস্থা। সফদর আলীর হাত চেপে ধরে বললাম, এখন?

সফদর আলী ভাঙা গলায় বললেন, ঝামেলা হয়ে গেল।

ঝামেলা। ইলেকট্রিক শক দিয়ে মেরে না ফেলে আমাদের!

না, মারতে পারবে না, ভোল্টেজ বেশি হলেও পাওয়ার খুব কম। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা চুলকে বললেন, সবগুলো যদি একসাথে আক্রমণ করে তাহলে অবশ্যি অন্য কথা।

সবগুলো তো একসাথেই আসছে। আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললাম, হাতের রডটা দিয়ে দেন না কয়েকটা ঘা।

সফদর আলী লোহার রডটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন, কাঠের হলে একটা কথা ছিল, এটা দিয়ে শক লেগে যাবে।

আমি বললাম, রুমাল দিয়ে ধরে নিন।

সফদর আলীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ঠিক বলেছেন। আমি আমার পকেট থেকে রুমালটা বের করে দিই, তিনি নিজেরটাও বের করে নেন। দুটি দিয়ে ভালো করে পেঁচিয়ে লোহার রডটা ধরে সফদর আলী এক পা এগিয়ে যান। গাছগুলো হঠাৎ থমকে

দাঁড়ায়। তারপর বেশিরভাগ সফদর আলীকে ঘিরে দাঁড়ায়। সফদর আলীও দাঁড়িয়ে পড়েন ভয়ে। একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে তিনি আরেকটু এগিয়ে যান, আর হঠাৎ গাছগুলো তার দিকে ছুটে আসে। আমি সবিস্ময়ে লক্ষ করলাম, ঠিক জ্যান্ত প্রাণীর মতো গাছগুলো সফদর আলীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর চটাশ চটাশ করে সে কী ভয়ানক স্পার্ক! আমি শুনলাম, সফদর আলী একবার ডাক ছেড়ে চিৎকার করে উঠে হাতের রডটা ঘুরিয়ে এক ঘা মেরে বসলেন। একটা গাছ মনে হল কাবু হয়ে গেল। অন্যগুলো কিন্তু হাল না ছেড়ে তার পিছনে লেগে থাকে।

আমার সম্বিৎ ফিরে আসতেই তাকিয়ে দেখি, সফদর আলীকে আক্রমণ করতে গিয়ে গাছগুলো খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিয়েছে, একটা লাফ দিলে হয়তো দরজা পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারি। দেরি না করে খোদার নাম নিয়ে আমি একটা লাফ দিয়ে বসি, শেষবার লাফ দিয়েছিলাম সেই ছেলেবেলায়, কত দিনের অনভ্যাস, লুটোপুটি খেয়ে কোনোমতে দরজার কাছে গিয়ে আছড়ে পড়লাম। উঠে দাঁড়াব, হঠাৎ অনুভব করলাম আমার পিছনে কী একটা যেন আছড়ে পড়ল, সাথে-সাথে কী ভয়ানক একটা ইলেকট্রিক শক! মনে হল পায়ের নখ থেকে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত কেউ যেন ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। গোঙানোর মতো একটা শব্দ করে আরেক লাফ দিয়ে দরজার বাইরে এসে আছড়ে পড়লাম।

খানিকক্ষণ লাগল সোজা হয়ে দাঁড়াতে। গাছগুলো দরজা পার হয়ে এপাশে আসতে পারবে না। ছোট একটা কাঠের পার্টিশান আছে। গাছগাড়ির চাকা আটকে যাবে সেখানে।

ঘরের ভেতর থেকে সফদর আলীর আরেকটা চিৎকার শুনতে পেলাম। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে কোমর চেপে বসে পড়তে হল, কোথায় জানি ভীষণ লেগেছে। সেই অবস্থায় হামাগুড়ি দিয়ে দরজার কাছে গিয়ে উঁকি দিই, সফদর আলী জানালা ধরে ঝুলে আছেন। গাছগুলো নিচে এসে জড়ো হয়ে শুঁড় দিয়ে তাঁকে ধরার চেষ্টা করছে। অনেক কষ্টে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। কিন্তু কতক্ষণ এভাবে ঝুলে থাকতে পারবেন? কিছু একটা করতে হয়, আমি এদিকে-সেদিকে তাকিয়ে ব্যবহার করার মতো কিছু না পেয়ে একটা চেয়ার তুলে নিয়ে এগিয়ে যাই। ভেতর থেকে সফদর আলী চিঁ চিঁ করে ডাকলেন, ইকবাল সাহেব।

কি?

দৌড়ে আধসের মাংস কিনে আনুন।

মাংস? কেন?

গাছগুলোকে খাওয়াতে হবে।

ততক্ষণ ঝুলে থাকতে পারবেন?

পারতে হবে, আপনি দৌড়ান।

আমি খোঁড়াতে খোঁড়াতে দৌড়ালাম। আশেপাশে কোনো মাংসের দোকান নেই। একটা রেস্টুরেন্টে ম্যানেজারকে অনেক বুঝিয়ে রান্না করা হয় নি এরকম খানিকটা মাংস দ্বিগুণ দাম দিয়ে কিনে আবার দৌড়াতে দৌড়াতে ফিরে আসি।

সফদর আলী তখনো জানালা ধরে ঝুলে আছেন। আমাকে দেখে চিঁ চিঁ করে বললেন, এতক্ষণ লাগল! দরদাম না করলে কী হত?

banglabook.com

আমি রেগে বললাম, কে বলল আমি দরদাম করছিলাম?

সফদর আলী চিঁ চিঁ করে বলেন, সবসময় তো করেন।

আমি রাগ এবং ব্যথা দুটিই চেপে রেখে বললাম, কী করব এখন মাংসগুলো?

ছুড়ে দিন গাছগুলোর দিকে।

আমি ছুড়ে দিলাম, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল মাংসগুলো। গাছগুলো ঘুরে গেল সাথে সাথে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মাংসের টুকরোগুলোর ওপর। বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ খেলা করতে থাকে খানিকক্ষণ, তারপর চুপচাপ হয়ে যায়। গাছের পাতাগুলো আঁকড়ে ধরে মাংসের টুকরোগুলোকে।

সাবধানে জানালা থেকে নেমে আসেন সফদর আলী। গাছগুলো মাংস খেতে ব্যস্ত, তার দিকে ঘুরেও তাকাল না। সফদর আলীর দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। কোনোমতে হেঁটে এসে একেবারে শুয়ে পড়েন মেঝেতে। আমি খুঁজে পেতে একটা খবরের কাগজ এনে তাঁকে বাতাস করতে থাকি। আমার নিজের অবস্থাও খারাপ। একটা চোখ আবার বুজে আসছে। কুনইয়ের কাছে কোথায় জানি ছাল উঠে গেছে। প্রচণ্ড জ্বালা করছে অনেকক্ষণ থেকে।

সফদর আলী চিঁ চিঁ করে বললেন, কাল থেকে সব গাছ মাটিতে। আর গাড়ি-ঘোড়া নয়—

আমি বললাম, কবি কি খামাখা বলেছেন—

বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে

গাছ থাকবে মাটির ওপর, গাড়িতে না ঘুরে।

সফদর আলী ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোন কবি লিখেছে এটা?

আমি উত্তর দেয়ার আগেই নিজেই বললেন, নিশ্চয়ই কবিগুরু। কবিগুরু ছাড়া এরকম খাঁটি জিনিস আর কে লিখবে?

সে-রাতে দু'হাতে ব্যান্ডেজ এবং বুজে যাওয়া চোখ নিয়ে যখন বাসায় ফিরে আসি, আমার মা দেখেই আঁৎকে ওঠেন। কী হয়েছে জিজ্ঞেস পর্যন্ত করলেন না। চোখে আঁচল দিয়ে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলেন, তোরা কে কোথায় আছিস দেখে যা, কী সর্বনাশ, ছেলে আবার গুণ্ডা পিটিয়ে এসেছে গো—

আমি এবারে প্রতিবাদ পর্যন্ত করলাম না। করে কী হবে?

পীরবাবা

আমাদের অফিসটি একটি বিচিত্র জায়গা। দিনে দিনে সেটি আরো বিচিত্র হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। একদিন সকালে অফিসে এসে দেখি সেকশন অফিসার ইদরিস সাহেব খালি গায়ে একটা ছোট হাফ প্যান্ট পরে ডান পা-টা নিজের ঘাড়ের ওপর তুলে বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে একটা কৌতূহলী ছোট ভিড়। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম বড়

banglabook.com

সাহেবের পিঠে ব্যথা শুনে ইদরিস সাহেব এই যোগাসনটি প্রেসক্রিপশান করেছেন, প্রতিদিন ভোরে আধঘন্টা করে করতে হবে। আরেক দিন দুপুরবেলা দেখি অফিসের মাঝখানে কেরোসিনের চুলোর ওপর একটা ডেকচিতে টগবগ করে পানি ফুটছে, সেখানে মাওলা সাহেব কী–সব গাছগাছড়া ছেড়ে দিচ্ছেন। সেটি থেকে কী একটা অব্যর্থ মলম তৈরি হবে। টাকমাথায় চুল গজাতে এই মলমের নাকি কোনো তুলনা নেই। মলমটি তৈরি হচ্ছে আমাদের বৃদ্ধ অ্যাকাউন্টেন্টের জন্যে। তাঁর মাথায় বিস্তৃত টাক এবং শোনা যাচ্ছে তিনি নাকি আরেক বার বিয়ে করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন। প্রতিদিন ভোরে অফিস শুরু হওয়ার আগে জলিল সাহেবের কাছে কেউ–না–কেউ আসবেই। তিনি স্বপ্নের অর্থ বলে দিতে পারেন। একদিন এসে দেখি আমাদের টাইপিস্ট মেয়েটি তাঁর সামনের চেয়ারে বসে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে। সে নাকি স্বপ্নে দেখেছে তার মা সাপের কামড় খেয়ে মারা গেছে। জলিল সাহেব তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, কাঁদার কিছু হয় নি মা, মৃত্যু স্বপ্ন হচ্ছে সুখস্বপ্ন। তোমার মায়ের হায়াত দশ বছর বেড়ে গেল। শুধু মনে করার চেষ্টা কর দেখি, সাপটা কি মদ্দা ছিল না মাদী সাপ ছিল?

বিচিত্র লোকজন নিয়ে বিচিত্র জায়গা এই অফিসটি। আমার বেশ লাগে। এর মধ্যে আমাদের সেকশন অফিসার মাওলা সাহেব একদিন এক পীরের মুরীদ হয়ে গেলেন। পীরের নাম হযরত শাহ্ খবিবুল্লাহ্ কুতুবপুরী। নামটা উচ্চারণ করার সময় গলার ভেতর থেকে আওয়াজ বের করতে হয়, আমি পাঁচ বার চেষ্টা করে মাওলা সাহেবের অনুমোদন পেলাম। মাওলা সাহেব আমাদের সামনে তাঁর পীরকে "শাহে হযরত" না হয় "হুজুরে বাবা" বলে সম্বোধন করেন। প্রথম সপ্তাহ আমাদের তাঁর কাছ থেকে শুধু চেহারার বর্ণনা শুনতে হল। ছয় ফুট উঁচু, নূরানী চেহারা, গায়ের রং ধবধবে সাদা। গালের কাছে নাকি একটু গোলাপি আভা। মসলিনের মতো সাদা দাড়ি বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে। মাথায় সিল্কের পাগড়ি। পরনে সাদা আচকান, সাদা লুঙ্গি, পায়ে জরির জুতো। হুজুরের দাড়ি থেকে নাকি জ্যোতির মতো আলো ছড়ায়। গলার স্বর মধুর মতো মিঠা। যখন কথা বলেন তখন গলার স্বর শুনে "দিল" ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মুরীদের সঠিক সংখ্যা কেউ জানে না। কেউ বলে পাঁচ লাখ, কেউ বলে দশ লাখ, আবার কেউ বলে মাত্র পঞ্চাশ। কারণ, খাঁটি নেকবন্দ লোক না হলে তিনি নাকি মুরীদ নেন না। হযরত শাহ্ খবিবুল্লাহ্ কুতুবপুরীর কথা বলতে বলতে মাওলা সাহেবের প্রত্যেক দিন অফিসের কাজ শুরু করতে দেরি হয়ে যায়।

প্রত্যেকদিন ভোরেই মাওলা সাহেবের কাছ থেকে আমরা হযরত শাহ্ কুতুবপুরীর খবরাখবর পেতে থাকি। একদিন শুনতে পেলাম, কোন কোম্পানির চিফ ইঞ্জিনিয়ার রুই মাছের মুড়ো খেতে গিয়ে গলায় কাঁটা বিধিয়ে ফেলেছেন। যন্ত্রণায় যখন কাটা মুরগির মতো ছটফট করছেন, তখন আত্মীয়স্বজন ধরাধরি করে শাহ্ কুতুবপুরীর কাছে নিয়ে এল। শাহ্ কুতুবপুরী গলায় হাত দিয়ে বললেন, কোথায় তোর মাছের কাঁটা? চিফ ইঞ্জিনিয়ার কথা বলতে গিয়ে কেশে ফেললেন। ছয় ইঞ্চি লম্বা মাছের কাঁটা বের হয়ে এল কাশির সাথে। বিশ্বাস না হলে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে গিয়ে দেখে আসা যায়। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের বউ নাকি সেই কাঁটা ফ্রেম করে ড্রয়িংরুমে সাজিয়ে রেখেছেন।

মাছের কাঁটার গল্প পুরানো হওয়ার আগেই মাওলা সাহেব নতুন একটা ঘটনা

শুনিয়ে দেন। স্বামী বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে ছয় বছর আগে। স্ত্রীর আহার নেই, নিদ্রা নেই, শাহ্ কুতুবপুরীর পায়ে এসে পড়ল একদিন। বলল, বাবা, আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দেন। শাহ্ কুতুবপুরী বললেন, মা, হায়াত-মউত খোদার হাতে, তবে তোর স্বামী যদি জিন্দা থাকে, তাকে তুই দেখবি। শাহ্ কুতুবপুরী তখন চোখ বন্ধ করে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। মিনিটখানেক পর শুধু হুঁ-উ-উ-উ-উ-ক করে একটা হুঙ্কার শোনা যায়। দুই ঘন্টা পর চোখ খুললেন কুতুবপুরী। ঘামে সারা শরীর ভিজে গেছে। বললেন, যা, তোর কোনো ভয় নেই, তোর স্বামী জিন্দা আছে। এক কাফির তাকে জাদু করে রেখেছিল পাহাড়ের উপর, হুজুর তাকে জাদু কেটে মুক্ত করে দিয়েছেন। সে রওনা দিয়েছে এদিকে। কাল ভোরে এসে পৌঁছে যাবে। পরদিন লোকে লোকারণ্য, তার মাঝে দেখা গেল ছয় বছর পর স্বামী ফিরে আসছে। বড় বড় চুল, বড় বড় দাড়ি, বড়-বড় নখ। নাপিত চুল-দাড়ি কেটে দিতেই আগের চেহারা।

মাওলা সাহেব নিজের চোখে দেখেন নি, কিন্তু হুজুরের বড় সাগরেদের কাছে শোনা, ফিরিশতার মতো লোক, তাঁকে অবিশ্বাস করেন কেমন করে?

বেশ চলছিল এভাবে, কিন্তু আস্তে-আস্তে গোলমাল বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হল। ব্যাপারটি শুরু হল এভাবে, মাওলা সাহেবের দৈনন্দিন বক্তৃতা শুনে শুনে আমাদের ছোট কেরানি আকমল সাহেব একদিন শাহ্ কুতুবপুরীর মুরীদ হয়ে গেলেন। পীরের মুরীদ হওয়ার অনেক সুবিধে, পীর নাকি তখন পরকালের বড় বড় দায়িত্বগুলো নিয়ে নেন। আকমল সাহেবের জন্যে এটা কল্পনার বাইরে, তিনি এমন নিষ্কর্মা মানুষ যে, পরকাল দূরে থাকুক, ইহকালের কোনো দায়িত্ব তাঁকে দেয়া যায় না। দুষ্টু লোকেরা বলে, আকমল সাহেব নাকি প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সিকি-আধুলি পর্যন্ত ঘুষ হিসেবে নিয়ে নেন। আকমল সাহেব মুরীদ হওয়ার পর অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হয়। তাঁর দেখাদেখি আরো কয়েকজন শাহ্ কুতুবপুরীর মুরীদ হয়ে গেলেন। অফিসে এখন বেশ জমজমাট একটা ধর্মীয় ভাব। পীরের দরবারের উরশ, ওয়াজ এবং মিলাদ-মাহফিলের খবরাখবর আমরা সকাল-বিকাল পেতে থাকি। পীরের মুরীদেরা তখন বেশ একটা সংঘবদ্ধ দল একসাথে বসে হুজুরে বাবার নামমাহাত্ম্য নিয়ে আহা-উহ্ করতে থাকেন।

যাঁরা যাঁরা তখনো পীরের মুরীদ হয়ে যান নি, তাঁদের ভবিষ্যৎ রক্ষা করার জন্যে ভক্ত মুরীদেরা নানারকম চেষ্টাচরিত্র করতে থাকেন। আমাদের হেড ক্লার্ককে সে প্রসঙ্গে একদিন একটু অনুরোধ করতেই ঝামেলার সূত্রপাত। ঘটনাটি এরকম : আকমল সাহেব দুপুরে টিফিন খাবার পর হেড ক্লার্ক আজিজ খাঁকে একা একা পেয়ে বললেন, আজিজ সাহেব, এ জীবন আর কয়দিনের?

আজিজ সাহেব বললেন, অনেকদিনের। কম হলে তো বেঁচেই যেতাম।

আকমল সাহেব না শোনার ভান করে বললেন, এখন যদি আল্লাহ্র দিকে না যাই তাহলে কখন যাব?

আজিজ সাহেব বললেন, যাচ্ছেন না কেন? কে আপনাকে নিষেধ করছে?

আপনারা যদি আসেন জোর পাই বুকে।

আজিজ সাহেব লাল হয়ে মেঘস্বরে বললেন, কী করতে হবে আমাকে?

যদি শাহ্ কুতুবপুরীর মুরীদ হয়ে যান, আমরা মুরীদ ভাইয়েরা—

আকমল সাহেব কথা শেষ করতে পারলেন না, আজিজ খাঁ তার আগেই একেবারে ফেটে পড়লেন, ঐসব কুতুবপুরী সম্বুন্ধীপুরী আমার কাছে আনবেন না। ভণ্ড চালবাজের দল, আপনার কুতুবপুরীর দাড়ি দিয়ে আমার হুজুর পা পর্যন্ত মুছবেন না।

কথা শেষ হওয়ার আগেই লিকলিকে শরীর নিয়ে আকমল সাহেব আজিজ খাঁয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রচণ্ড হাতাহাতি শুরু হওয়ার অবস্থা, আমরা টেনে সরিয়ে রাখতে পারি না।

সেই থেকে আকমল সাহেব আর আজিজ খাঁয়ের মুখ দেখাদেখি বন্ধ। কিন্তু খবর ছড়িয়ে গেল দ্রুত। আজিজ খাঁয়ের মতো লোকেরও নিজের পীর আছে। শুধু তাই নয়, সেই পীর নাকি হযরত শাহ্ খবিবুল্লাহ্ কুতুবপুরীর দাড়ি দিয়ে পা পর্যন্ত মোছেন না। লোকজন খবর নিতে আসে। স্বল্পভাষী আজিজ খাঁ বলবেন না বলবেন না করেও একটা দুটো কথা বলে ফেলেন। শুনে সবার ভিরমি লেগে যায়। একটি গল্প এরকম : আঠার বছরের মেয়েকে নিয়ে মা এসেছেন পীরের কাছে। দুই বছর থেকে সেই মেয়ের ওপর জিনের আছর। মেয়ে পীরকে দেখে আর এগুতে চায় না, কারণ সহজ, মেয়ে তো আসলে মেয়ে নয়, তাকে চালাচ্ছে এক কাফির জিন, জিনদের ভেতরেও নামাজী এবং কাফির জিন আছে। পীর খালি একবার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তারপর এক হাত সুতা নিয়ে বসলেন। একটা করে সুরা পড়েন আর সুতায় একটা করে গিঁট দেন, সাথে সাথে জিনের সে কী চিৎকার! বলে, বাবাগো, মাগো, ছেড়ে দাও, সুলায়মান পয়গম্বরের কসম আমাকে ছেড়ে দাও। পীর বললেন, শালার ব্যাটা, তুই এখনি দূর হয়ে যা। তখন জিন আর যেতে চায় না, হুজুরের সাথে তখন কী ভয়ংকর ঝগড়া! কিন্তু হুজুরের সাথে পারবে সে সাধ্যি কার আছে? শেষ পর্যন্ত জিন যেতে রাজি হল। হুজুর বললেন, যাওয়ার আগে একটা চিহ্ন দিয়ে যা। জিন জিজ্ঞেস করল, কী চিহ্ন দিয়ে যাব? হুজুর বললেন, দরবারের সামনে আমগাছের একটা মোটা ডাল ভেঙে দিয়ে যা। মুহূর্তে মেয়ে চোখ খুলে তাকায়, আর ঝড় নেই বৃষ্টি নেই মড়মড় করে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে। আজিজ খাঁ শুধু গল্প বলেই ক্ষান্ত হলেন না, ঘোষণা করলেন যারা যারা ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে চায় সামনের শুক্রবার তাদের নিয়ে যাবেন, নিজের চোখে সেই আমগাছের ভাঙা ডাল দেখে আসবে।

পরের সপ্তাহে বেশ কয়জন আজিজ খাঁর সাথে পীরের দরবার থেকে ঘুরে এলেন। আজিজ খাঁয়ের গল্পে কোনো মিথ্যা নেই। সত্যি সত্যি দরবারের সামনে আমগাছের ভাঙা ডাল। তখন–তখনি কয়েকজন সেই পীরের মুরীদ হয়ে গেল।

এরপর অফিস দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। হযরত শাহ্ খবিবুল্লাহ্ কুতুবপুরীর মুরীদেরা এবং হযরত মাওলানা নূরে নাওয়াজ নকশবন্দীর মুরীদেরা। আমরা কয়েকজন কোনো দলেই নেই এবং আমাদের হল সবচেয়ে বিপদ। দু'দলের ওয়াজ–নসীহত, উরশ এবং মিলাদের চাঁদা দিতে দিতে ফতুর হয়ে যাবার মতো অবস্থা। এক দলকে পাঁচ টাকা চাঁদা দিলে আরেক দল দশ টাকা না নিয়ে ছাড়ে না, তখন আবার প্রথম দল এসে আরো পাঁচ টাকা নিয়ে সমান সমান করে দেয়। চাঁদা না দিয়ে উপায় নেই। এক দুই মিনিট অনুরোধ করেই হুমকি দেয়া শুরু হয়ে যায়। দেখে–শুনে মনে হল সবকিছু ছেড়েছুড়ে নিজেই পীর হয়ে যাই। পীর যদি হতে না পারি, অন্তত ধর্মটা পাল্টে ফেলি। অফিসে এক জন বৌদ্ধ কেরানি আছে, দিলীপকুমার বড়ুয়া, তাকে কেউ কখনো